Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education as a History Text Book for Class VII (Vide notification No. T. B VII/H/81/97 Dated 8.1.81)

মধ্যযুগের ইতিহাস

[সপ্তম শ্রেণীর জন্য]



শ্রীবৈদ্যনাথ বসু, এম. এ. (ইংরাজী ও ইতিহাস), বি. টি.
কেম্ব্রিজ মাস্টার সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত ; শিক্ষক, বালিগঞ্জ
জগবন্ধু ইন্‌ষ্টিটিউশন, কলিকাতা ; ভূতপূর্ব শিক্ষক,
বালিগঞ্জ রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়, কলিকাতা ; ভূতপূর্ব
সহকারী প্রধান শিক্ষক, রামরিক
ইন্‌ষ্টিটিউশন, কলিকাতা।

দীপালী বুক হাউস
১২/১ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক :
শ্রীঅধীরচন্দ্র সরকার
১২/১ বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

সংশোধিত, পরিবর্দ্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, জানুয়ারী—১৯৮৫

মূল্য : এগার টাকা মাত্র
(ছাপা মূল্যর অতিরিক্ত দিবেন না)

মুদ্রাকর :
শ্রীগণেশকুমার ভাণ্ডারী
লক্ষ্মী প্রিন্টার্স
২১/১বি, পটুয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৯

মুখবন্ধ

ভুলিলে চলিবে না আমরা ভারতবাসী, আবার বিশ্ববাসীও বটে। তাই শুধু স্বদেশের ইতিহাসেই আমাদের মন ভরে না, সমগ্র বিশ্বকে জানিবার আমাদের উদগ্র বাসনা। শুধু তাহাই নহে, জাতীয়তা ও আন্তর্জাতীয়তা বর্তমান শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়া ইতিহাসের পাঠ্যসূচী পুনর্বিন্যাসে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা পর্ষদের প্রচেষ্টা প্রশংসার দাবী রাখে সন্দেহ নাই। ইতিহাসকে কেবল সন-তারিখের বেড়াজালে আবদ্ধ ঘটনাপ্রবাহের নিছক ডায়েরী না করিয়া উহাকে কিশোরমনের উপযোগী করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই পুস্তকপাঠে বালকবালিকাদের ইতিহাসে কিঞ্চিৎ অনুরাগ সৃষ্টি হইলে পরিশ্রম সার্থক মনে করিব। এ বিষয়ে সকল শিক্ষক ও শিক্ষিকার সহযোগিতা কামনা করি।

—শ্রীবৈদ্যনাথ বসু

সূচীপত্র

অধ্যায় ১

মধ্যযুগ—ইহার অর্থ ও ব্যাপ্তিকাল

প্রথম পরিচ্ছেদ

মধ্যযুগ—ইহার অর্থ

'মধ্যযুগ' কাহাকে বলে? প্রাচীন যুগের অবসান ও আধুনিক যুগের সূত্রপাত—এই দুই কালের মধ্যবর্তী যুগকে 'মধ্যযুগ' আখ্যা দেওয়া হয়।

প্রাচীন যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকটি উন্নত সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়াছিল। যেমন নীল নদের ধারে মিশরের সভ্যতা, উইফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর ধারে মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা, ইয়াংসি ও পীত নদীর ধারে চীনের সভ্যতা, সিন্ধু নদের ধারে ভারতের সিন্ধু সভ্যতা ইত্যাদি। ইহা ছাড়া, ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে গড়িয়া উঠিয়াছিল প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতা। কিন্তু সভ্যতা কখনও একটি নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ থাকে না। ইউরোপে মধ্যযুগে সভ্যতার ক্ষেত্র ভূমধ্যসাগর হইতে উত্তরাঞ্চলে প্রসারিত হইয়াছিল। আটলান্টিক মহাসাগরের তীর-ভূমি ফ্রান্স, স্পেন, হল্যাণ্ড, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে।

এখন প্রশ্ন হইল, প্রাচীন যুগ কখন শেষ হইল এবং মধ্যযুগই বা কখন আরম্ভ হইল। ইহার সঠিক উত্তর পাওয়া যায় না। কেননা কোন নির্দিষ্ট তারিখ বা বৎসর হইতে কোন যুগের সূচনা হয় না বা মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশকে ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া দেখান যায় না। তবে ঐতিহাসিকগণ কোন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া এক এক যুগের সীমানা নির্ধারণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে হূণদের আক্রমণে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতনের বৎসর হইতে এক গৌরবময় যুগের অবসান হইল এবং ইউরোপে মধ্যযুগের সূচনা হইল। ভারতবর্ষেও খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে হূণ জাতির আক্রমণে শক্তিশালী গুপ্তসাম্রাজ্যের পতন হইলে মধ্যযুগের সূচনা হইয়াছিল বলা যায়।

ইউরোপে প্রাচীন ও মধ্যযুগদ্বয়ের সময়সীমা নির্ধারণে ৪৭৬ খৃষ্টাব্দ ভিন্ন অন্য কোন সুবিধাজনক বৎসর আর নাই। কেননা ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে বিস্তৃত রোম সাম্রাজ্য

ভাঙ্গিয়া যায়, ইউরোপের রাষ্ট্রীয় ঐক্য চিরতরে বিনষ্ট হয়। রোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে জার্মান জাতিসমূহ নূতন নূতন রাজ্য স্থাপন করে। রোমের শাসনাধীনে ইউরোপে ছিল একরাষ্ট্র। ক্রমে সৃষ্টি হইল ভিন্ন ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র। ফলে ইউরোপের সমাজের চেহারাটাই পাল্টাইয়া গেল। এই নূতন সমাজ ছিল গ্রামীণ ও কৃষিভিত্তিক। সামন্তপ্রথা, দাসত্বপ্রথা প্রভৃতি ইউরোপীয় মধ্যযুগের সামাজিক জীবনের প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে সমাজের অর্থনীতি ভিন্ন রূপ ধারণ করিল। ধর্মীয় ব্যাপারেও মধ্যযুগের ইউরোপে পরিবর্তন আসিল। জার্মান জাতিসমূহ খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিল। সমাজে সামন্তদের ন্যায় খৃষ্টান যাজকদেরও প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইল। মঠে, গীর্জায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য-জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্ম-চিকিৎসা-আইন প্রভৃতি নূতন ভাবে চর্চা হইতে লাগিল। রোমান স্থাপত্য শিল্পের অনুকরণে এক নূতন স্থাপত্য রীতির উদ্ভব হইল। মোট কথা প্রাচীন রোম সভ্যতার ভিত্তির উপর ইউরোপে নূতন সভ্যতা ও সংস্কৃতির বনিয়াদ রচিত হইল, প্রাচীন যুগের অবসানে মধ্যযুগের সূচনা হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মধ্যযুগের ব্যাপ্তিকাল

পৃথিবীর অধিকাংশ অঞ্চলে খৃষ্টীয় পঞ্চম হইতে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ পর্যন্ত কালকে মধ্যযুগ আখ্যা দেওয়া হয়। যদিও এইরূপ সময় বিভাগ অবাস্তব তবুও ঐতিহাসিকগণ নূতন ও পুরাতনের মধ্যে ব্যবধান রচনার জন্য এইরূপ সময় বিভাগ করিয়া থাকেন। কোন নির্দিষ্ট বৎসর হইতে মধ্যযুগের সূত্রপাত বা কোন নিদিষ্ট বৎসরে ইহার অবসান—ইহা নির্ণয় করা সহজ নয়। কেননা জাতির জীবন একটি অখণ্ড ও অবিচ্ছিন্ন ধারা এবং ইতিহাসের গতি এক যুগ হইতে অন্য যুগে আবর্তিত হয় অত্যন্ত ধীর গতিতে এবং লোকচক্ষুর সম্পূর্ণ অন্তরালে। এক যুগ হইতে অপর যুগের বিকাশ ঘটে ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে। ঐতিহাসিক যুগ সমূহকে নিদিষ্ট তারিখের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ইহাদের গতি ও প্রকৃতি উপলব্ধি করিবার চেষ্টা সুবিধাজনক হইলেও এই

গতি ও প্রকৃতি উপলব্ধি করিবার চেষ্টা সুবিধাজনক হইলেও এই প্রক্রিয়ায় ঐতিহাসিক যথার্থতা বিনষ্ট হয় এবং একটি ধীর ও বিরামবিহীন পরিবর্তনকে বিকৃত করা হয়। তাহা ছাড়া, এক যুগের সম্পূর্ণ অবসান আর এক যুগের আরম্ভ বাস্তবে সম্ভব নহে। কারণ পুরাতন যুগের অবসানের পূর্বেই নূতন যুগের নানাচিহ্ন স্পষ্ট হইয়া উঠিতে থাকে আবার নূতন যুগের সঙ্গে পুরাতন যুগের বৈশিষ্ট্যগুলি একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় না। তাই বলা যায় নূতন-পুরাতন মিশ্রণেই এক যুগের সূচনা।

৪৭৬ খৃষ্টাব্দে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর হইতে ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের পতনের সময় পর্যন্ত ইউরোপে মধ্যযুগের ব্যাপ্তিকাল ধরা হয়। ভারতবর্ষে ইহার ব্যাপ্তিকাল ধরা হয় ৫৯৫ খৃষ্টাব্দে গুপ্তযুগের অবসানের সময় হইতে ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামার সর্বপ্রথম জলপথে ভারতে আসার সময় পর্যন্ত। অবশ্য ভারতে মধ্যযুগের ব্যাপ্তিকাল সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য আছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিভিন্নদেশে "মধ্যযুগ" ও প্রকৃতিগত বৈষম্য

মধ্যযুগে প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যগুলি যে সকল দেশেই খৃষ্টীয় পঞ্চম হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা নহে। আবার বিভিন্ন দেশে মধ্যযুগের প্রকৃতিও ছিল সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এই যুগের স্থিতিকালও বিভিন্ন দেশে ছিল ভিন্ন ভিন্ন। খৃষ্টীয় পঞ্চম হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপ ও ভারতে মধ্যযুগের প্রসার ঘটিলেও কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে ভারতে মধ্যযুগের স্থায়িত্ব ছিল ১২০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। ১২০৬ খৃষ্টাব্দে ভারতে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মুসলমানদের শাসনকাল শেষ হয় ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধের অবসানে। তাঁহারা বলেন ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদের ভারতে রাজনৈতিক আধিপত্য লাভের সূচনা হয় এবং এই সময় হইতে ভারতে আধুনিক যুগের সূত্রপাত। জাপানে মধ্যযুগ অক্ষুণ্ণ ছিল ১৮৬৭ পর্যন্ত। এই বৎসর সম্রাট মুৎসুহিতো তাঁহার যাবতীয় রাজকীয় ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ফিরিয়া পাইয়াছিলেন। চীন

দেশে মধ্যযুগ চলিয়াছিল ১৯১২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে মাঞ্চু রাজবংশের পতনের পর সান ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে চীনে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে সেখানে আধুনিক যুগ আরম্ভ হয়। মধ্যযুগে অধিকাংশ দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সামরিক অবস্থা নিয়ন্ত্রিত হইত সামন্ততন্ত্রের মাধ্যমে। ইউরোপের অধিকাংশ দেশ ও ভারতবর্ষে সামন্ততন্ত্র ছিল। জাপানে সামন্ততন্ত্র প্রচলিত থাকিলেও চীনের সামন্ততন্ত্র দুর্বল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

মধ্যযুগে ইউরোপ ও ভারতবর্ষ বহির্বাণিজ্যে ব্যাপক ভাবে অংশ গ্রহণ করে। মধ্যযুগে ইংল্যাণ্ড, ইটালী প্রভৃতি ইউরোপের কয়েকটি দেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব হইলেও ভারত, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল না। একই সময়সীমার মধ্যে সকলদেশের মধ্যযুগ চিহ্নিত করা যায় না বা মধ্যযুগের গতিপ্রকৃতি সকল দেশে একই ধরনের হইবে তাহাও সম্ভব হয় না।

অনুশীলনী

বাস্তবভিত্তিক ও মৌখিক প্রশ্নাবলী ঃ

১। কোন্ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে মধ্যযুগের সূচনা হইয়াছিল ?
২। কোন খৃষ্টাব্দে রোম সাম্রাজ্যের পতন হইয়াছিল ?
৩। কোন ইউরোপীয় নাবিক সর্বপ্রথম জলপথে ভারতে আসিয়াছিলেন ?
৪। ভারতে মধ্যযুগ কত খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়াছিল ?
৫। ভারতে আধুনিক যুগের সূত্রপাত কখন হইয়াছিল ?
৬। জাপানে কত খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মধ্যযুগ অক্ষুণ্ণ ছিল ?
৭। কাহার নেতৃত্বে চীনে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী ঃ

১। মধ্যযুগ কাহাকে বলে ?
২। প্রাচীন যুগে পৃথিবীর কোন্ কোন্ অঞ্চলে উন্নত সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়াছিল ?
৩। মধ্যযুগে পৃথিবীর কোন্ কোন্ দেশে সামন্ততন্ত্র ছিল ?
৪। মধ্যযুগে বিশ্বে কোন্ কোন্ দেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল ?

রচনাত্মক প্রশ্নাবলী ঃ

১। কোন এক নির্দিষ্ট বৎসর হইতে কোন্ যুগের সূচনা কতদূর যুক্তিসঙ্গত ?
২। ইউরোপের মধ্যযুগীয় বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে আলোচনা কর।
৩। ভারত, ইউরোপ, চীন ও জাপানে মধ্যযুগের স্থিতিকাল ও তাহাদের মধ্যযুগের প্রকৃতিগত বৈষম্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণী দাও।

অধ্যায় ২

পশ্চিম ইউরোপে মধ্যযুগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

হূণদের আক্রমণ ও পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতন

খৃষ্টীয় যুগের প্রারম্ভেই ভূমধ্যসাগরের চারিপাশ ঘিরিয়া এক শক্তিশালী ও সমৃদ্ধশালী রোম সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠে। ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার বিস্তার্ণ অঞ্চল এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সাম্রাজ্যের বিস্তারে, ক্ষমতায়, ঐশ্বর্যে, সমৃদ্ধিতে, সুশাসনে, সুললিত ল্যাটিন সাহিত্যে ও অপূর্ব স্থাপত্য শিল্পে রোম তখন উন্নতির চরম শিখরে। এককথায় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশে রোম সাম্রাজ্য তখন সারা পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত এই সাম্রাজ্যের গৌরব ছিল অক্ষুন্ন। কিন্তু খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের শেষ ভাগ হইতে এই সাম্রাজ্যের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে অবনতির চিহ্নগুলি স্পষ্ট হইয়া উঠিল। ফলে ইহার পতনও আসন্ন হইল। শেষের দিকের রোম সম্রাটগণ ছিলেন তুর্বল ও অকর্মণ্য। শাসনকার্য অবহেলা করিয়া ভোগবিলাসে তাঁহারা মত্ত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতালোভী ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা তুর্নীতিপরায়ণ ও অত্যাচারী হইয়া উঠিল। ক্রীতদাসদের উপর অকথ্য অত্যাচার চলিতে লাগিল। সৈন্যদলে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল, ব্যবসা-বাণিজ্যের অবনতি ঘটিল, দেশে উৎপাদন হ্রাস পাইল, জনসাধারণ করভারে জর্জরিত হইল, চারিদিকে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিল। রোম ক্রমশঃ হীনবল হইয়া পড়িল। এই সুযোগে কতকগুলি জাতির আক্রমণে রোম সাম্রাজ্যের পতন শুরু হইল। এই পতন হঠাৎ একদিনেই হয় নাই। বিশাল রোম সাম্রাজ্য যেমন ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছিল তেমনি ধীরে ধীরে আবার তাহা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল।

যে সকল জাতি রোম সাম্রাজ্যের ধ্বংসের মূলে ছিল তাহাদের মধ্যে গথ, ফ্রাঙ্ক, ভাণ্ডাল, বার্গাণ্ডী প্রভৃতি জার্মান জাতিসমূহ এবং হূণ নামে এক তুর্ধর্ষ মঙ্গোলীয় জাতি উল্লেখযোগ্য।

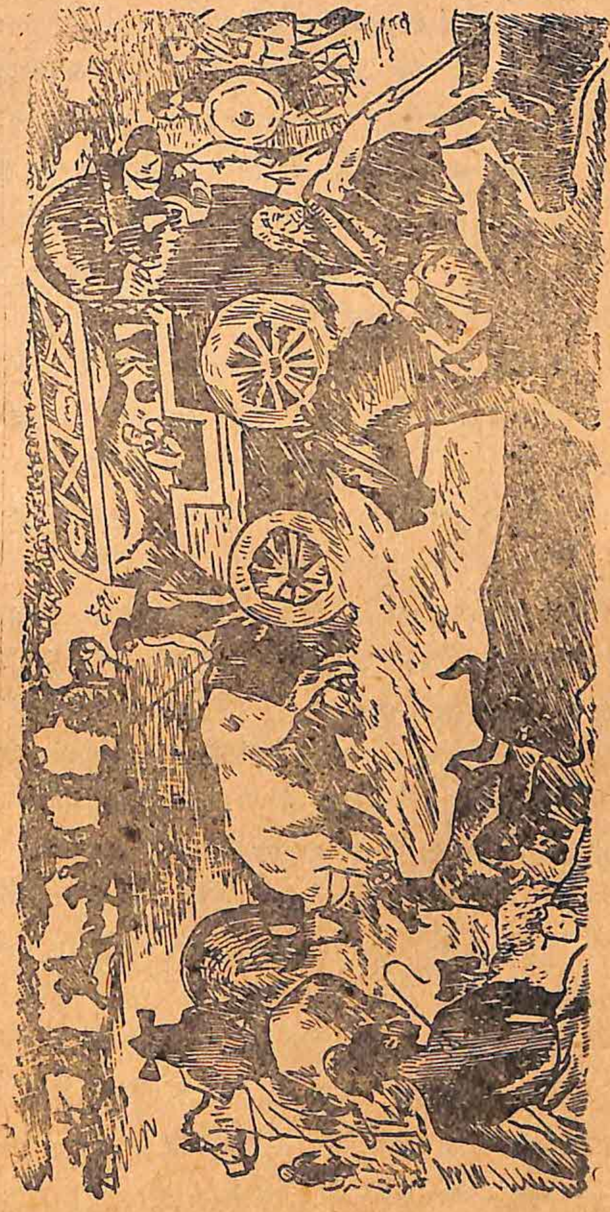
খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতক হইতে রোম সাম্রাজ্যের ক্রমাবনতির সুযোগ

লইয়া জার্মান জাতিগুলি রোম সাম্রাজ্যের সীমান্তে রাইন নদীর তীরে বসবাস করিতে থাকে। প্রথমে তাহারা রোমের আধিপত্য স্বীকার করিয়া লইয়া, রোম সেনাবাহিনীতে যোগদান করিয়া, রোম সাম্রাজ্যের সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব পালন করিয়া আপন আপন দলপতির অধীনে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট হয়। পরে হূণদের আক্রমণের চাপে তাহারা দলে দলে রোম সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং হীনবল রোমানরা তাহাদের বাধা দিতে পারে না। বরং তাহাদের শক্তি ও সামর্থ্যের উপর রোম সম্রাটগণ নির্ভরশীল হইয়া উঠেন। পরে এই জার্মান জাতিগুলি রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান করিলে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের শেষ ভাগে মধ্য এশিয়ার হূণ নামে এক যাযাবর দুর্ধর্ষ মঙ্গোলীয় জাতি ঝড়ের বেগে আসিয়া ইউরোপের চারিদিকে হানা দেয়। এই হূণরা ছিল নিষ্ঠুর ও হিংস্র প্রকৃতির। লুঠপাঠ, নরহত্যা, ধ্বংস করাতেই তাহাদের আনন্দ। তাহাদের গায়ের রঙ ছিল পীত, চেহারা ছিল খর্বাকৃতি ও কদাকার। মাথায় ছিল তাহাদের কালো লম্বা চুল আর নাক ছিল চেপ্টা। কিন্তু তাহাদের শক্তি ও সাহস ছিল অসাধারণ। তাহারা ছিল কর্মঠ, কষ্টসহিষ্ণু ও যুদ্ধনিপুণ। অশ্ব চালনায় তাহারা ছিল অত্যন্ত দক্ষ। অশ্বের পৃষ্ঠেই তাহাদের বেশীর ভাগ সময় কাটিত। যে জনপদের উপর দিয়া তাহারা যাইত তাহা একেবারে ধ্বংস করিয়া দিয়া যাইত। নির্বিবাদে তাহারা নরহত্যা করিত। শিশু, বৃদ্ধ, নারী কেহই তাহাদের হাত হইতে রেহাই পাইত না।

ইহাদের হিংস্র ও নিষ্ঠুর অত্যাচারে ইউরোপের চারিদিকে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। কি রোমান কি জার্মান সবাই ভীতত্রস্ত হইয়া পড়ে।

হূণদের আক্রমণের চাপে ভিসিগথেরা রোম সাম্রাজ্যের ভিতরে প্রবেশ করে এবং কিছুদিনের মধ্যেই তাহারা তাহাদের নেতা এলিরিকের নেতৃত্বে রোম আক্রমণ করে এবং অধিকার করিয়া লয়। এলিরিকের মৃত্যুর পর ভিসিগথরা গলের (বর্তমান ফ্রান্সের) দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে বসতি স্থাপন করে।

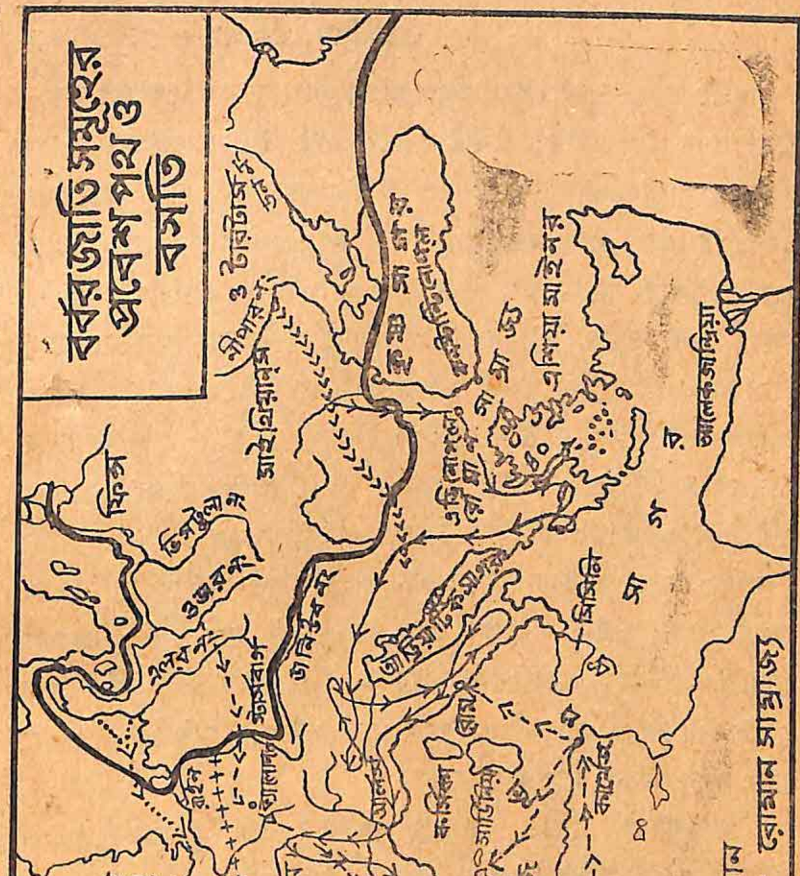


জার্মান বর্বরগণ দলে দলে রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করছে।

ইতিমধ্যে হূণরা তাহাদের দলপতি এটিলার নেতৃত্বে মধ্য ইউরোপ অধিকার করিয়া পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী কন্‌স্টান্‌টিনোপল পর্যন্ত অগ্রসর হয়। এটিলাকে বাধা দিবার ক্ষমতা পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের ছিল না। ইহার পর বিপুল বাহিনী লইয়া এটিলা পশ্চিমে রোম সাম্রাজ্য জয় করিবার উদ্দেশ্যে গলদেশ আক্রমণ করেন। সেখানে প্রথমে বাধা পাইলেও কিছুদিনের মধ্যেই তিনি পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী রোমে আসিয়া উপস্থিত হন। রোমের ধর্মগুরু পোপের অনুরোধে এটিলার হাত হইতে সে যাত্রা রোম রক্ষা পায়।

হূণদের আক্রমণ হইতে রোম রক্ষা পাইল বটে কিন্তু জার্মানদের হাত হইতে রোম নিষ্কৃতি পায় নাই। পর পর ভিসিগথ, ভাণ্ডাল, ফ্রাঙ্ক, বার্গাণ্ডী, অস্ট্রোগথ প্রভৃতি জার্মানগণ রোম সাম্রাজ্যের গোটা পশ্চিমাংশ অধিকার করিয়া লয়। অবশেষে এক গথ সেনাপতি পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের শেষ রোম সম্রাট রোমুলাস অগাষ্টুগাসকে অপসারণ করিয়া নিজে সিংহাসনে বসেন। এই সঙ্গে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতন হয়, ইহার শেষ গৌরব-রশ্মিটুকু চিরতরে বিলীন হইয়া যায়।

পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর ইউরোপে সভ্যতা ও সংস্কৃতি যেন সহসা লুপ্ত হইয়া গেল। রোমান সাম্রাজ্যের বিচ্ছিন্ন অংশসমূহ তাহাদের পূর্ব ঐক্যের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইল। চারিদিকে দেখা দিল অরাজকতা ও দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার। জার্মান অনুপ্রবেশের ফলে ইউরোপের ভাষা ও রীতিনীতির ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দিল। ক্রমে রোমান সাম্রাজ্যের প্রায় সব কিছুই বিলুপ্ত হইয়া গেল, কেবলমাত্র অক্ষুণ্ণ রহিল রোমান ধর্মাধিষ্ঠান ও আইনবিধি। জার্মান জাতিরা রোমানদের নিকট হইতেই খৃষ্টধর্মে দীক্ষা লইয়াছিল। দেশ শাসনে বা আইন কানুন সম্বন্ধে তাহারা অনভিজ্ঞ ছিল বলিয়া রোমান আইনবিধি মানিয়া লইয়াছিল। রোমান সাম্রাজ্য খণ্ড, বিখণ্ড ও বিক্ষিপ্ত হইল সত্য, কিন্তু রোমান ধর্মাধিষ্ঠান জনগণের বিশ্বাস, নিয়মানুবর্তিতা এবং ঐক্যের প্রতীক হইয়া রহিল। জার্মান জাতিসমূহ রোম জয় করিলেও রোমের ভাবধারা ও রীতিনীতি জয় করিতে পারে নাই।


বর্বরজাতি সমূহের প্রবেশপথ ও বসতি
ভ্যাণ্ডাল
ভিসিগথ
অস্ট্রোগথ
অ্যাংলো স্যাকসান
ফ্রাঙ্ক
রোমান সাম্রাজ্য
আলেকজান্দ্রিয়া
ড্যানিউব নদী
রোম
কর্সিকা
সার্ডিনিয়া
কার্থেজ
জিব্রাল্টার
গল
ফ্রিজল্যাণ্ড
ইটালি
সিসিলি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

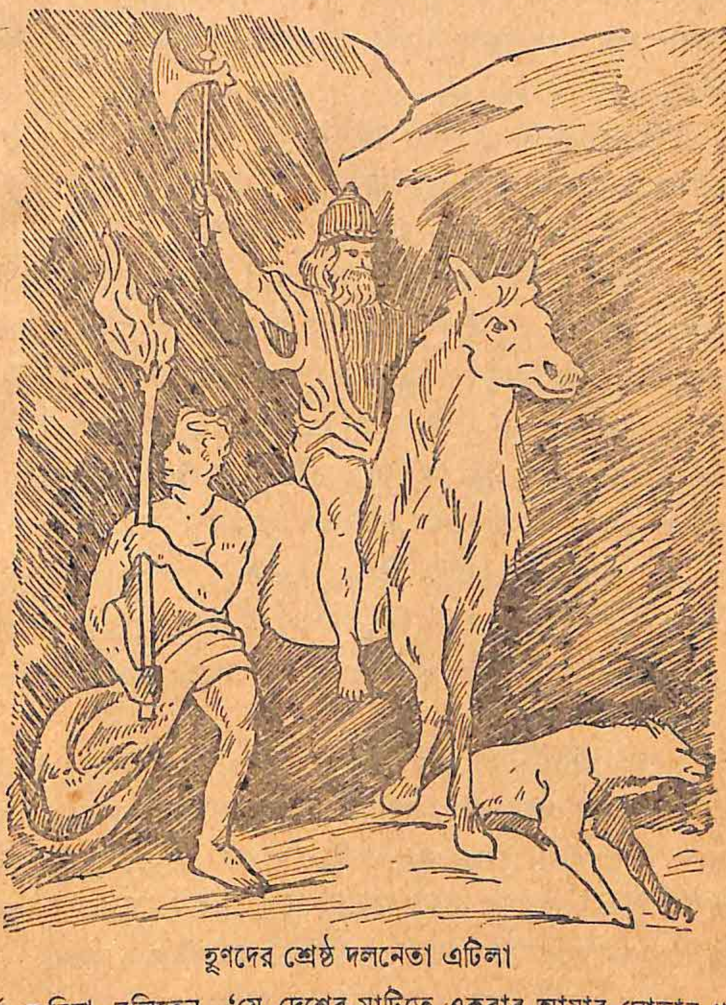
এলেরিক, এটিলা, ও গেইসেরিক

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের শেষ দিকে দুর্দান্ত হূণরা যখন ইউরোপের নানা-স্থানে হানা দিয়া আতঙ্কের সৃষ্টি করিতেছিল সেই সময়ে তাহাদের ভয়ে ভীত হইয়া ভিসিগথ নামে এক জার্মান সম্প্রদায় রোম সাম্রাজ্যে বসবাসের জন্য রোম সম্রাটের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। রোম সম্রাট তাহাদের ড্যানিয়ুব নদীর দক্ষিণাংশে বসবাস করিবার অনুমতি দেন। এই সময়ে ভিসিগথরা বীরযোদ্ধা এলেরিককে তাহাদের প্রথম রাজা বা দলপতি হিসাবে নির্বাচিত করে। প্রথম দিকে রোম সম্রাটের সহিত এলেরিকের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রোম সাম্রাজ্যের বিশৃঙ্খল অবস্থার সুযোগ লইয়া ভিসিগথরাজ এলেরিক খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের গোড়ার দিকে রোম আক্রমণ করেন। তিনি তিনবার রোম আক্রমণ করেন এবং অবশেষে ৪১০ খৃষ্টাব্দে তিনি রোম নগরী দখল করেন। যুদ্ধের প্রথমদিকে রোম সাম্রাজ্যের ভাণ্ডাল সেনাপতি ষ্টিলিকো এলেরিকের আক্রমণ প্রতিরোধ করেন। ষ্টিলিকোর মৃত্যুর পর ভিসিগথরা অমিতবিক্রমে রোম অভিমুখে অভিযান করে এবং রোম দখল করিয়া ব্যাপক লুণ্ঠন করে।

ভিসিগথগণ রোমের বড় বড় শস্যাগার এবং মূল্যবান পোষাক পরিচ্ছদের দোকানগুলি লুণ্ঠন করে। ইহা ছাড়া, তাহারা প্রচুর পরিমাণে সোনা, রূপা, রেশম প্রভৃতিও লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়। রোমের কারুকার্য শোভিত বৃহৎ অট্টালিকাগুলি দেখিয়া এলেরিক বিস্ময়ে হতবাক হইয়া যান। কিন্তু এইগুলি তাঁহার নিকট হইতে অব্যাহতি পায় নাই। তিনি রোমের বৃহৎ অট্টালিকাগুলি পোড়াইয়া ছারখার করেন। ফলে রোমের অনেক অমূল্য গ্রন্থ ও শিল্পকীর্তি চিরদিনের জন্য লুপ্ত হইয়া যায়। ভিসিগথদের হাতে রোমের এই দুর্দশা পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের আসন্ন পতনেরই ইঙ্গিত বহন করে। রোম বিজয়ের অল্পকাল পরেই এলেরিকের মৃত্যু হয়।

হূণদের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ দলনেতা ছিলেন **এটিলা**। দলনেতা হিসাবে তিনি ছিলেন প্রবল পরাক্রান্ত। এশিয়ার কাস্পিয়ান সাগর হইতে ইউরোপের রাইন নদী পর্যন্ত তাঁহার আধিপত্য বিস্তৃত ছিল।

এটিলার চেহারা যেমন ছিল কদাকার, তাঁহার স্বভাবও ছিল তেমনি। পৃথিবীর ইতিহাসে এটিলার নিষ্ঠুরতার জুড়ি পাওয়া যায় না। তিনি



হূণদের শ্রেষ্ঠ দলনেতা এটিলা

গর্ব করিয়া বলিতেন, 'যে দেশের মাটিতে একবার আমার ঘোড়ার খুর স্পর্শ করিয়াছে, সে দেশের মাটিতে আর কখন তৃণও উৎপন্ন হইবে না'। কৃষ্ণসাগর হইতে বল্কান উপদ্বীপ পর্যন্ত ভূভাগ চরম নিষ্ঠুরতার

সহিত তিনি অধিকার করেন এবং প্রখ্যাত ঐতিহাসিক গিবন বলেন যে, বল্কান অঞ্চলে তিনি সত্তরটি শহর সম্পূর্ণ ধ্বংস করেন।

একটির পর একটি অঞ্চল অধিকার করিয়া এটিলা পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী কন্‌স্টান্‌টিনোপল পর্যন্ত অগ্রসর হইলে রোম সম্রাট থিয়োডোসিয়াস তাঁহাকে প্রচুর অর্থ দিয়া নিরস্ত করেন এবং এটিলাকে গোপনে হত্যা করিবারও ষড়যন্ত্র করেন। তাঁহার এ ষড়যন্ত্র অবশ্য ব্যর্থ হয়।

ইহার পর এটিলা গলদেশ (বর্তমান ফ্রান্স) আক্রমণ করেন। এই সময়ে রোমান, ফ্রাঙ্ক, গথ ও অন্যান্য জার্মান জাতি সম্মিলিতভাবে এটিলাকে আক্রমণ করে। দুইপক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই যুদ্ধে এটিলা পরাজিত হন। এই যুদ্ধে প্রায় দেড় লক্ষ লোক নিহত হয়। এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়াও এটিলা কিন্তু ভগ্নোদ্যম হন নাই। কিছুদিনের মধ্যেই নিজ শক্তি পুনরুদ্ধার করিয়া তিনি রোম নগরের দ্বারদেশে উপনীত হন। এটিলাকে প্রতিরোধ করিবার শক্তি হীনবল রোমানদের ছিল না। তখন স্বয়ং রোমের ধর্মগুরু পোপ রোমকে রক্ষা করিবার জন্য এটিলাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করেন। পোপের অনুরোধে এটিলা ফিরিয়া গেলেন। অবশ্য সঙ্গে লইয়া গেলেন প্রচুর ধনরত্ন। ইহার কিছুকাল পরেই ৪৫৩ খৃষ্টাব্দে এটিলার মৃত্যু হয় এবং তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ইউরোপে হূণদের আধিপত্য লুপ্ত হইয়া যায়।

জার্মান উপজাতি ভাণ্ডালগণ ছিল হূণদের ন্যায় দুর্ধর্ষ জাতি। তাহারা প্রথমে রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত স্পেনে বসবাস করে। পরে তাহারা তাহাদের দলনেতা গেইসেরিকের নেতৃত্বে আফ্রিকার উত্তরাঞ্চলে এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে। ৪৩৯ খৃষ্টাব্দে তাহারা কার্থেজ নগরী অধিকার করে এবং একটি নৌ-বাহিনী গঠন করে।

গেইসেরিক ছিলেন আফ্রিকার প্রথম ভাণ্ডাল দলপতি। প্রায় আটত্রিশ বৎসর কাল তিনি ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের উপর আধিপত্য করেন। গেইসেরিক ছিলেন অসাধারণ নিপুণ যোদ্ধা

বুদ্ধিও ছিল তাঁহার তীক্ষ্ণ। প্রথম যৌবনে একটি অশ্বের পদাঘাতে আহত হইয়া সমস্ত জীবন তিনি খোঁড়াইয়া চলিতেন। তিনি ছিলেন নিষ্ঠুর প্রকৃতির। তাঁহার বর্বরতা এইরূপ চরম আকার ধারণ করিয়াছিল যে আধুনিক শব্দ 'ভ্যাণ্ডালিজম্' (Vandalism)—(চরম উচ্ছৃঙ্খল আচরণ) তাঁহার কার্যাবলী হইতেই উদ্ভুত হইয়াছে।

৪৫৫ খৃষ্টাব্দে গেইসেরিকের নেতৃত্বে এক বিশাল ভাণ্ডালবাহিনী রোম লুণ্ঠন করে। বেশ কয়েক দিন ধরিয়া এই লুণ্ঠন কার্য ও ধ্বংসলীলা চলিতে থাকে। রোমের এক বিশাল নৌ-বাহিনীকে গেইসেরিক পোড়াইয়া ফেলেন। কার্থেজ জলদস্যুদের দমন করিবার উদ্দেশ্যে পূর্ব ও পশ্চিম রোমের সম্রাটদ্বয় প্রায় এক লক্ষ সৈন্যের এক বাহিনী লইয়া ত্রিপলী হইতে কার্থজ পর্যন্ত অঞ্চলে অভিযান করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই অভিযান ব্যর্থ হয়।

গেইসেরিক-এর রাজত্বকালের শেষ দশ বৎসর ইটালী ও সিসিলিতে অনেকগুলি নৌ-অভিযান প্রেরণ করেন। ৪৭৭ খৃষ্টাব্দে ভাণ্ডাল নেতা গেইসেরিকের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর আরও পঞ্চাশ বৎসরকাল ইউরোপে ভাণ্ডালদের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ ছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জার্মান জাতিসমূহের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবন এবং রোমানদের সহিত তাহাদের মিশ্রণ

রোমান সাম্রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে ছিল মধ্য ইউরোপের অরণ্যময় বিস্তীর্ণ জলাভূমি। সেখানে বাস করিত জার্মান জাতীয় লোকেরা। কৃষ্টি ও শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত রোমানগণ অবজ্ঞা করিয়া উহাদিগকে 'বর্বর' বলিত। এই জার্মান জাতিসমূহের বহু তথ্য রোমান সেনাপতি জুলিয়াস সীজারের 'কমেন্টারিজ্' এবং রোমান ঐতিহাসিক ট্যাসিটাসের 'জার্মানিয়া' (৯৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত) গ্রন্থ দুইটিতে পাওয়া যায়।

এই জার্মান জাতিসমূহ আর্য জাতির এক শাখা এবং তাহারা কথা বলিত আর্যভাষায়। ইহারা ছিল দীর্ঘকায় ও সুগঠিত। ইহাদের চুল ছিল পিঙ্গলবর্ণ এবং চোখ নীল।

এই জার্মানরা বাস করিত গ্রামে। তাহাদের গ্রামগুলি ছিল দূরে দূরে সবুজ মাঠ ও ঝরণার ধারে। শত্রুর আক্রমণ হইতে প্রতিরক্ষার জন্য গ্রামের চারিদিকে মজবুত কাঠের খুঁটি দিয়া বেড়া দেওয়া থাকিত। ইহাদের ঘরগুলির দেওয়াল ছিল কাঠের কাঠামোর উপরে মাটি লাগানো এবং চাল ছিল খড়ে ছাওয়া।

প্রথম দিকে জার্মানদের উপজীবিকা ছিল মৎস্য ও পশু শিকার। পরে তহারা চাষবাস ও পশুপালনে লিপ্ত হইল। গরু ও লাঙ্গল দিয়া তাহারা জমি চাষ করিত। গম ও যব ছিল তাহাদের প্রধান উৎপন্ন শস্য। তাহাদের প্রধান খাদ্য ছিল মাছ, মাংস, দুধ, শাকসবজী ও আপেল। গৃহপালিত পশুর মধ্যে গরু, ঘোড়া, ছাগল ও ভেড়াই ছিল প্রধান। তাহারা ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া যাতায়াত করিত ও রথচালনা করিত। রথের দৌড় ছিল তাহাদের প্রধান ক্রীড়া।

জার্মানরা ছিল যুদ্ধপ্রিয় জাতি। যুদ্ধে তাহারা চামড়ার ঢাল ও শিরস্ত্রাণ ব্যতীত ব্যবহার করিত বর্শা, কুঠার ও তরবারি। তাহারা সাধারণতঃ ঘোড়ায় চড়িয়া যুদ্ধ করিত।

জার্মান পুরুষরা ছিল যেমন অসীম সাহসী ও শক্তিশালী, জার্মান রমণীরাও ছিল তেমনই সাহসী। কখনও কখনও তাহারা যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করিত।

জার্মান সমাজের জনগণ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—অভিজাত, স্বাধীন প্রজা ও ক্রীতদাস। জার্মানদের মধ্যে ছিল বহু উপজাতি। এই উপজাতিরা ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক গোষ্ঠীতে একজন করিয়া দল নেতা থাকিত। এক একটি গোষ্ঠীতে আবার ছোট-বড় অনেকগুলি দল থাকিত। ছোট দলকে বলা হইত 'হাণ্ড্রেড' বা শতক ; কারণ যুদ্ধের সময় এক একটি ছোট দলকে একশত জন করিয়া

যোদ্ধা যোগান দিতে হইত। প্রত্যেক গোষ্ঠীতে দশ হাজার হইতে বিশ হাজার যোদ্ধা থাকিত।

জার্মানদের প্রত্যেক গোষ্ঠীতে একটি করিয়া জনপরিষদ ছিল। এই জনপরিষদ গোষ্ঠীপতি বা দলনেতা নির্বাচন করিত এবং যুদ্ধ ঘোষণা, সন্ধি-স্থাপন প্রভৃতি সব কাজ নির্বাহ করিত।

জার্মানরা বহু দেব-দেবীর পূজা করিত। এই সব দেব-দেবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিলেন 'ওডিন' এবং 'থর'। এই ওডিনের নামানুসারে 'ওয়েডনেসডে' এবং থরের নামানুসারে 'থার্সডে'র নামকরণ হইয়াছে। জার্মান জাতি পরে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়। ইহাদের মধ্যে গথ সম্প্রদায়ই প্রথম খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে।

জার্মানরা পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য অধিকার করিয়া এই রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বসবাস করিতে থাকে। ভিসিগথরা স্পেনে, ফ্রাঙ্করা ফ্রান্সে ও জার্মানীতে, অস্ট্রোগথরা ইটালীতে, ভাণ্ডালরা উত্তর আফ্রিকায়, বার্গাণ্ডীয়রা ফ্রান্সের দক্ষিণ পূর্বাংশে এবং এ্যাঙ্গল ও স্যাক্সন শাখার জার্মান জাতি বৃটেনে আপন আপন প্রভুত্ব স্থাপন করে। যে সকল অঞ্চলে ইহারা বসবাস করিত সেই সব অঞ্চলের রোমান অধিবাসীদের সহিত তাহারা ক্রমে মিশিয়া যায়। তাহারা পরস্পর পরস্পরে বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়, রোমানদের খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে এবং ভ্রাতৃত্ববোধে অনুপ্রাণিত হয়।

অনুশীলনী

বাস্তবভিত্তিক ও মৌখিক প্রশ্নাবলী ঃ

১। ট্যাসিটাস কোন্ দেশীয় ঐতিহাসিক ছিলেন ?

২। কোন্ দেবতার নামানুসারে 'থার্সডে'-র নামকরণ হইয়াছে ?

৩। গলদেশের বর্তমান নাম কি ?

৪। পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট কে ছিলেন ?

৫। ষ্টিলিকো কোন্ জার্মান জাতির সেনাপতি ছিলেন ?

৬। 'কমেণ্টারিস' গ্রন্থটি কে রচনা করেন ?

৭। থিয়োডোসিয়াস কোথাকার সম্রাট ছিলেন ?

৮। এলেরিক কোন্ জার্মান সম্প্রদায়ের দলনায়ক ছিলেন ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী ঃ

১। কোন্ কোন্ জাতি রোমান সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল ?

২। হূণদের আকৃতি ও প্রকৃতি কিরূপ ছিল ?

৩। এটিলার হাত হইতে রোম কিরূপে রক্ষা পায় ?

৪। ভিসিগথরা কিরূপে ড্যানিয়ুব নদীর দক্ষিণাংশে বসবাস আরম্ভ করিয়াছিল ?

৫। ভিসিগথদের রোম আক্রমণ ও লুণ্ঠনের বিবরণ দাও।

৬। 'ভ্যাণ্ডালিজম্' (Vandalism) বলিতে কি বোঝ ?

৭। ভিসিগথদের নেতা কে ছিলেন ?

৮। এটিলা কে ছিলেন ? কত খৃষ্টাব্দে এটিলার মৃত্যু হয় ?

৯। ভ্যাণ্ডালদের নেতার নাম কি ?

১০। কোন্ কোন্ গ্রন্থ থেকে জার্মান জাতির পরিচয় পাওয়া যায় ?

১১। জার্মান জাতির যুদ্ধ দেবতা কে কে ছিলেন ?

রচনাভিত্তিক প্রশ্নাবলী ঃ

১। পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতনের বিবরণ দাও।

২। এলেরিক, এটিলা ও গেইসেরিকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৩। মধ্যযুগের জার্মান জাতিসমূহের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবন বর্ণনা কর।

৪। হূন জাতির একটি বিবরণ দাও।

৫। গেইসেরিক কে ছিলেন ? তাঁহার রোম আক্রমণ বর্ণনা কর।

৬। জার্মান জাতির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৭। এলারিক কে ছিলেন ? তাঁহার রোম আক্রমণ বর্ণনা কর।

৮। জার্মান জাতির বসতি বিস্তার সম্বন্ধে বিবরণ দাও।

অধ্যায় ৩

ইউরোপে অন্ধকার যুগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইউরোপে অন্ধকার যুগ—এক ভ্রান্ত ধারণা

পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। রাষ্ট্রনৈতিক সংহতি ও ঐক্যবোধ বিলুপ্ত হইল, দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিনষ্ট হইল, রোমান সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধ্বংস হইবার উপক্রম হইল। জার্মানগণ পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য অধিকার করিয়া নগরের পর নগর পুড়াইয়া দিয়াছিল, শিল্প-মূর্তিগুলি ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল, ধনসম্পদ লুণ্ঠন করিয়াছিল, নিরীহ জনসাধারণকে হত্যা করিয়াছিল এবং রোমান লেখকের পুঁথিসমূহ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াছিল। লোকেরা ভাবিল বুঝি বা 'অন্ধকার যুগ' নামিয়া আসিয়াছে। পণ্ডিতগণ খৃষ্টীয় চতুর্থ হইতে সপ্তম শতক পর্যন্ত কালকে ইউরোপে 'অন্ধকার যুগ' বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের এ ধারণা ঠিক নহে। কেননা বহু বিপর্যয়ের মধ্যেও খৃষ্টীয় ধর্মাধিষ্ঠান-সমূহ রোমান কৃষ্টি ও ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে সচেষ্ট হইয়াছিল। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের শেষভাগে রোমান সম্রাট থিওডোসিয়াসের শাসনকালে খৃষ্টধর্ম রোমান সাম্রাজ্যের সর্বপ্রধান ধর্মরূপে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল।

এই খৃষ্টান ধর্মাধিষ্ঠানসমূহ ধর্মচর্চার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশে বিদ্যা ও জ্ঞান-চর্চা প্রসারে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। এই ধর্মাধিষ্ঠানগুলি নূতন করিয়া রোমান পুঁথিগুলি লিখিতে উদ্যোগী হইল। নবীন চেতনায় জার্মানদের অনুপ্রাণিত করিল। এইভাবে নূতন কৃষ্টির নানা উপাদান সৃষ্টি করিয়া খৃষ্টীয় ধর্মাধিষ্ঠানসমূহ দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিকাশে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। তাই বলা হইয়াছে, রোমের পতন হইল, কিন্তু খৃষ্টের উত্থান হইল।

মধ্য যুগের কৃষ্টির ভিত্তি যাহাই হউক না কেন ইহার প্রকৃত চরিত্র ছিল ধর্মীয়। একটি সভ্যতার বিলোপে অপর একটি সভ্যতার উৎপত্তি

কয়েক শতাব্দী ব্যাপী স্থায়ী এক দীর্ঘ ও জটিল প্রক্রিয়া। জার্মান পৌত্তলিকতার সংস্কার সাধন করিতে খৃষ্টীয় ধর্মাধিষ্ঠানসমূহে নিজেদের সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে নিয়োজিত করিয়াছিল খৃষ্টীয় চতুর্থ হইতে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে। সুতরাং খৃষ্টীয় চতুর্থ হইতে সপ্তম শতক ইউরোপে 'অন্ধকার যুগ' নহে, ইহা নূতন কৃষ্টি ও নূতন সভ্যতা সৃষ্টির ভিত্তি রচনার যুগ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ধর্মাধিষ্ঠানসমূহে শিক্ষা-দীক্ষার অবিরত চর্চা

পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতনের পরও ধর্মাধিষ্ঠানসমূহই ছিল বিদ্যা-শিক্ষার একমাত্র কেন্দ্র এবং সেখানে শিক্ষা-দীক্ষার চর্চা চলিত। ধর্মাধিষ্ঠানসমূহের বাহিরে সে সময়ে শিক্ষার কোন সুযোগ ছিল না। পোপ, বিশপগণ ও সাধারণ ধর্মযাজকগণ শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-চর্চায় বিশেষ অগ্রণী ছিলেন এবং জার্মান নরপতিগণও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ বিষয়ে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতেন।

খৃষ্টীয় চতুর্থ হইতে সপ্তম শতক পর্যন্ত শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞান-চর্চার অভাব ছিল না। এই যুগের পণ্ডিতগণের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন সেণ্ট অগাস্টাইন, বীথিয়াস, ক্যাসিওডোরাস, সেন্ট বেনিডিক্ট, পোপ গ্রেগরী, ইসিডোর ও এ্যালডেহেল্‌ম।

বীথিয়াস ব্যতীত অন্যান্য সকলেই ছিলেন খৃষ্ট ধর্মযাজক। সেণ্ট অগাস্টাইন 'ঈশ্বরের নগরী' (The City of God) নামে একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি এই গ্রন্থে লিখিয়াছেন—এ পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষ এক একজন তীর্থযাত্রী; ক্ষণস্থায়ী জীবনে ভগবান যীশুর প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্যই মুক্তির একমাত্র উপায়। এ কথা বলা চলে যে সেণ্ট অগাস্টাইনের প্রেরণাতেই তথাকথিত 'অন্ধকার যুগে' খৃষ্টীয় ধর্মাধিষ্ঠান ও রোমান সভ্যতা টিকিয়া ছিল। বীথিয়াস ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক। তিনি 'দর্শনের সান্ত্বনা'

(Consolation of Philosophy) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ক্যাসিওডোরাসও অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে তাঁহার 'প্রতিষ্ঠানসমূহ' (Institutions) গ্রন্থটি পৌত্তলিক ও খৃষ্টীয় শিক্ষার সারবস্তু। ইটালীর সেন্ট বেনিডিক্ট খৃষ্টধর্মালম্বীদের অবশ্য পালনীয় অনেকগুলি নিয়মকানুন প্রবর্ত্তন করেন।

খৃষ্টীয় জগতের ধর্মগুরু ছিলেন গ্রেগরী দি গ্রেট। মধ্যযুগে তিনি এক স্মরণীয় নাম কেননা রোম সাম্রাজ্যের ধ্বংসের মুখে তিনি খৃষ্টীয় ধর্মাধিষ্ঠানগুলিকে রক্ষা করিবার কার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। তিনি খৃষ্টীয় ধর্মাধিষ্ঠানগুলির সংস্কার সাধন করিয়া, তাহাদের সুসংগঠিত করিয়া, সম্রাটদের প্রভাবমুক্ত স্বাধীন প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করেন। সেন্ট ইসিডোর ভাষা, ইতিহাস, ধর্ম প্রভৃতি নানা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার বিশ্বকোষ-জাতীয় গ্রন্থটি সে যুগে জনপ্রিয় ছিল। মোট কথা, চতুর্থ হইতে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত তথাকথিত 'অন্ধকার যুগে' ধর্মচর্চা এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যা ও জ্ঞানানুশীলন হ্রাস পায় নাই। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের শেষ ভাগে পুরাতন দুনিয়ার কৃষ্টির মৃদু আলোক প্রজ্বলিত করিয়া রাখিয়াছিলেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ও কবি বীড। বীড ছিলেন একজন ধর্মযাজক। তিনি অনেকগুলি গ্রন্থও রচনা করেন। তাঁহার প্রায় এক হাজার শিষ্য দেশে বিদেশে জ্ঞান ও ধর্ম প্রচারে ব্রতী হন।

সে সময়ে পুস্তক পাঠে জনসাধারণের বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। লিখিবার ভাষা তখন ছিল ল্যাটিন। কিন্তু পশ্চিম ইউরোপের অধিকাংশ ব্যক্তি ল্যাটিন পড়িতে সক্ষম হইলেও লিখিতে পারিত না। বীড অবশ্য তাঁহার মাতৃভাষা এ্যাংলোস্যাকসনে গ্রন্থ রচনা করেন। এই সময়ে জ্ঞান ও বিদ্যার উৎকর্ষ হওয়ায় সাহিত্যানুরাগও বৃদ্ধি পায়। ইংলণ্ডের কবি সন্ন্যাসী কিড্‌মন এ্যাংলোস্যাকসন ভাষায় ধর্মমূলক কবিতা লিখিয়া কৃতিত্বের পরিচয় দেন। পশ্চিম ইউরোপের সর্বত্র ধর্মাধিষ্ঠানে ও বিদ্যাচর্চার ভাষাও ছিল ল্যাটিন। ল্যাটিন ভাষায় সে যুগে ব্যাকরণে, ছন্দে, বাগ্মিতায় ও সাহিত্যে বহু পুস্তক রচিত হইয়াছিল।

এইভাবে খৃষ্টীয় যাজকগণ তাঁহাদের ধর্মাধিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে পুরাতন রোমান সভ্যতার ভিত্তির উপর নূতন কৃষ্টির উপাদানসমূহ সৃষ্টি করিয়া তথাকথিত 'অন্ধকার যুগে' আলোর সন্ধান দিয়াছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সভ্যতা বিকাশে খৃষ্টীয় ধর্মাধিষ্ঠানসমূহের শিক্ষার প্রভাব

মধ্য ও আধুনিক যুগের সভ্যতা বিকাশে খৃষ্টান ধর্মাধিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতনের মুখে রক্ষণশীল রোমান ধর্মযাজকগণ বুঝিয়াছিলেন যে জার্মানদের অগ্রগতি প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রোমান সাম্রাজ্যের নাই। তাই রোমান সভ্যতাকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য জার্মানদের খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করা তাঁহাদের প্রধান কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন এবং তাঁহাদের দলে দলে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন।

খৃষ্ট ধর্মের প্রভাবে জার্মানগণ সংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হইতে থাকে। নিয়মানুবর্তিতা, নম্রতা, উদারতা, আনুগত্য, আত্মত্যাগ প্রভৃতি মানবিক ধর্মে অনুপ্রাণিত হয়। ক্রমে তাহারা পাপ-পুণ্যবোধে, ভাল-মন্দ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়। খৃষ্টধর্ম তাহাদের এই শিক্ষা দিয়াছিল যে যাহারা সৎপথে ও ন্যায় পথে চলে তাহারা রক্ষা পায় এবং অসৎ ও অন্যায় পথে যাহারা পা বাড়ায় তাহারা ধ্বংস হয়। শুধু তাহাই নহে, সত্য ও ন্যায়ধর্মীরা ভগবানের রাজ্যের নাগরিক হইয়া মূল্যবান পুরস্কার অমরত্ব লাভ করে। অসত্য ও অন্যায়কারী পাপীরা ধ্বংস হয় এবং চিরকালের জন্য জ্বলন্ত আগুনে জ্বলিয়া শাস্তিলাভ করে।

পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায় বোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া জার্মানগণ ক্রমে ধর্মপ্রাণ হইয়া উঠিল। তাহারা শিখিল যুদ্ধ জয় নয়, আত্মজয়ই একমাত্র বাঁচিবার পথ।

জার্মান জাতিসমূহের মধ্যে এই সকল ধারণা প্রচার হইবার ফলে সভ্যতার বিকাশ সহজসাধ্য হইয়াছিল।

অনুশীলনী

বাস্তবভিত্তিক ও মৌখিক প্রশ্নাবলী ঃ

১। পণ্ডিতগণ কোন সময়কে ইউরোপে 'অন্ধকার যুগ' বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন ?

২। 'ঈশ্বরের নগরী' (The city of God) গ্রন্থটি কে লিখিয়াছিলেন ?

৩। সেণ্ট অগাষ্টাইন কে ? ৪। পোপ গ্রেগরী দি গ্রেটের নাম স্মরণীয় কেন ?

৫। 'দর্শনের সান্তনা' (consolation of Philosophy) গ্রন্থের রচয়িতা কে ?

৬। সেণ্ট ইসিডোর কোন কোন বিষয়ের উপর গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন ?

৭। বীড কোন্ ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন ?

৮। সেণ্ট বেনিডিক্ট কোন দেশের লোক ছিলেন ?

৯। কিড্‌মন কোন ভাষায় কবিতা রচনা করেন ?

১০। 'প্রতিষ্ঠান সমূহ' (Institutions) গ্রন্থটি কে রচনা করেন ?

১১। মধ্যযুগে পশ্চিম উইরোপে কোন ভাষায় বিদ্যাচর্চা হইত ?

সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্নাবলী ঃ

১। ইউরোপের লোকেরা তাহাদের দেশসমূহে 'অন্ধকার যুগ নামিয়া আসিয়াছে'—একথা ভাবিয়াছিল কেন ?

২। খ্রীষ্টিয় চতুর্থ হইতে সপ্তম শতকের মধ্যে ইউরোপের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের নাম উল্লেখ কর।

৩। জার্মানগণ কিভাবে ধর্মপ্রাণ হইয়া উঠিয়াছিল ?

৪। 'ঈশ্বরের নগরী' গ্রন্থের বিষয়বস্তু কি ?

৫। মধ্যযুগে ল্যাটিন ভাষার চর্চা কিরূপ হইত ?

৬। খ্রীষ্টধর্মের প্রভাবে জার্মান জাতিসমূহের চরিত্রে কি পরিবর্তন দেখা গিয়াছিল ?

রচনাত্মক প্রশ্নাবলী

১। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ হইতে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের ইতিহাসের যুগকে 'অন্ধকার যুগ' আখ্যা দেওয়া কি যুক্তিসঙ্গত ?—আলোচনা কর।

২। ইউরোপীয় সভ্যতা বিকাশে খৃষ্টান ধর্মাধিষ্ঠানসমূহের প্রভাব বর্ণনা কর।

৩। তথাকথিত 'অন্ধকার যুগে' ধর্মাধিষ্ঠানসমূহে শিক্ষা-দীক্ষার অবিরত চর্চা কিরূপে হইত ?

অধ্যায় ৪

বাইজান্টাইন সভ্যতা

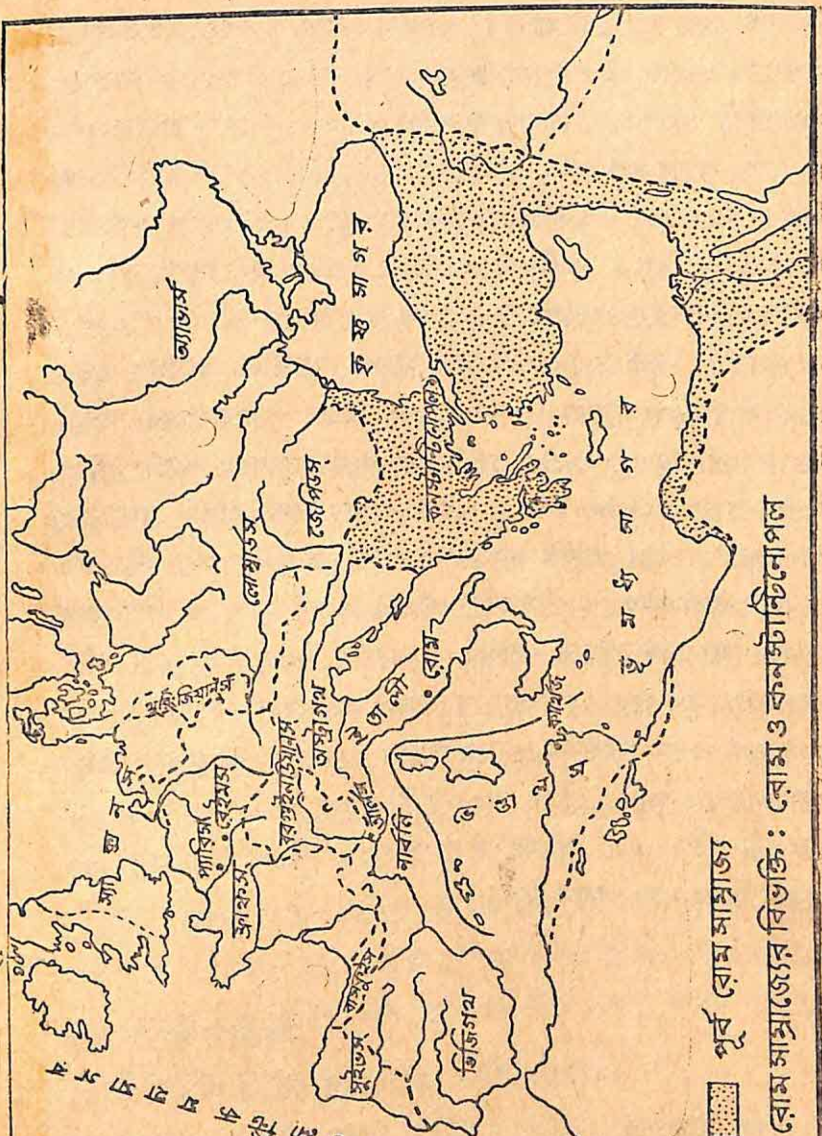
প্রথম পরিচ্ছেদ

কনস্টান্টিনোপল নগরীর প্রতিষ্ঠা

গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডার যেমন মিশরে আলেকজান্দ্রিয়া নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন তেমন ৩৩০ খৃষ্টাব্দে রোম সম্রাট মহামতি কনস্টান্টাইন কৃষ্ণসাগরের মুখে বসফোরাস প্রণালীর উপকূলে কনস্টান্টিনোপল নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন। আলেকজাণ্ডারের নামানুসারে যেমন আলেকজান্দ্রিয়া নগরীর নামকরণ হইয়াছিল তেমনি সম্রাট কনস্টান্টাইনের নামানুসারে কনস্টান্টিনোপল নগরীর নামকরণ হয়। কনস্টান্টিনোপলের বর্তমান নাম ইস্তাম্বুল এবং ইহা এখন তুরস্ক রাজ্যের অন্তর্গত।

এক সময়ে কনস্টান্টিনোপলে গ্রীকদের একটি উপনিবেশ ছিল। তখন ইহাকে বলা হইত বাইজান্টাইন। এই বাইজান্টাইন বা কনস্টান্টিনোপল নগরীকে কেন্দ্র করিয়া যে বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল ইতিহাসে তাহা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য বলিয়া পরিচিত। বল্কান উপদ্বীপ, এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, মিশর প্রভৃতি এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সাম্রাজ্য পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল বলিয়া পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যকে বাইজান্টিয়ান সাম্রাজ্য বলা হয়। এই সাম্রাজ্যকে ঘিরিয়া যে সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল তাহা বাইজান্টাইন সভ্যতা নামে খ্যাত। কনস্টান্টিনোপল নগরী প্রতিষ্ঠা বাইজান্টাইন সভ্যতা বিকাশে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

বিশাল সাম্রাজ্যের সুশাসন ও শৃঙ্খলা এবং বিশেষ করিয়া বর্বর জাতিসমূহের আক্রমণ হইতে সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার উদ্দেশ্যেই সম্রাট কনস্টান্টাইন পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যে এক নূতন নগরী প্রতিষ্ঠার কল্পনা করেন। ইতিমধ্যে কনস্টান্টাইন তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীদের অপসারিত করিয়া পশ্চিম ও পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি হন। রাইন ও ড্যানিয়ুব নদীর তীরে অবস্থিত রোম সাম্রাজ্যের উত্তর সীমান্ত এবং পারস্য বরাবর ইহার পূর্ব সীমান্ত নিরাপদ ছিল না। পূর্ব-রোম



রোম সাম্রাজ্যের বিভক্তি : রোম ও কনস্টান্টিনোপল

সাম্রাজ্যের এমন একটি নগরীর প্রয়োজন ছিল যে স্থান হইতে আক্রান্ত অঞ্চলসমূহে দ্রুত সাহায্য প্রেরণ করা যায়। সে দিক দিয়া কনস্টান্টাইন নূতন নগরীর জন্য উপযুক্ত স্থানই বাছিয়া লইয়াছিলেন।

এই নগরীর ভৌগোলিক অবস্থান ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। নগরীটি কৃষ্ণসাগর ও ভূমধ্যসাগরের সঙ্গমে অবস্থিত হওয়ায় জলপথে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে যাতায়াত সহজ ছিল। বিদেশী হানাদারদের প্রতিরোধ করার জন্য এখানে সৈন্যদের ঘাঁটি নির্মাণের পক্ষে সুবিধাজনক ছিল। দ্বিতীয়তঃ, বিদেশী হানাদারদের পক্ষে এই নগরীতে প্রবেশ করাও কঠিন ছিল। তৃতীয়তঃ, গরীটি এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যস্থলে অবস্থিত হওয়ায় দুই দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যেরও সুবিধা ছিল।

সম্রাট কন্‌স্টান্টাইন কনস্টান্টিনোপল নগরীকে 'প্রাচ্যের নূতন রোম' নগরীরূপে গড়িয়া তুলিলেন এবং ইহার অধিবাসীদের আখ্যা দিলেন 'রোমান'। নগরীর চারিদিকে দুর্ভেদ্য দুর্গসমূহ প্রাচীর দিয়া ঘিরিয়া সুরক্ষিত করা হইল। শ্বেত প্রস্তরে বহু প্রাসাদ, স্নানাগার, রঙ্গশালা, দোকান প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করাইয়া নগরীটিকে অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত করিয়া তোলা হইল। গ্রীস হইতে উৎকৃষ্ট প্রস্তর মূর্তি ও শিল্পকলার নিদর্শন আনাইয়া ইহার সৌন্দর্য অভাবনীয় রূপে বৃদ্ধি করা হইল এবং ইহার মধ্যস্থলে একটি প্রস্তরে উৎকীর্ণ করা হইল 'ইহাই পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল'। কনস্টান্টাইন এখানে তাঁহার নিজের মূর্তিও স্থাপন করেন। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতক হইতে কনস্টান্টিনোপল পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল এবং রোমের পতনের পরও ইহার গৌরব প্রায় এক হাজার বৎসর যাবৎ অক্ষুণ্ণ ছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ধর্মরূপে খৃষ্টধর্ম

কনস্টান্টিনোপল নগরীর প্রতিষ্ঠা এবং খৃষ্টধর্মকে বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ধর্মরূপে গ্রহণ—এই কার্য দুইটি রোম সম্রাট কনস্টাণ্টাইনকে ইতিহাসে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

শোনা যায় সম্রাট কনস্টাণ্টাইন যীশুখৃষ্টের ক্রুশ প্রতীক লইয়া কোন এক যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন। তাই তিনি নিজে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন।

রোম সম্রাটের মধ্যে কনস্টান্টাইনই সর্বপ্রথম খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। শুধু তাহাই নহে, তিনি খৃষ্টধর্মকে রোম সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ধর্ম রূপে স্বীকৃতি দেন। রাজধর্মরূপে স্বীকৃতি পাইয়া খৃষ্টধর্ম সাম্রাজ্যের চারিদিকে অবাধে প্রচারিত হইতে থাকে এবং বহু লোক খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়।

খৃষ্টধর্ম রাষ্ট্রীয় ধর্ম হওয়ায় কনস্টান্টিনোপলের বহু অধিবাসী খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে এবং কনস্টান্টিনোপল নগরী মুখ্যতঃ খৃষ্টানদের নগরীতে পরিণত হয়। অবশ্য খৃষ্টধর্মকে প্রাচ্যের নূতন ধর্ম বলিয়া স্বীকৃতি দিলে কন্‌স্টান্টাইনকে প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। কেননা তাঁহার প্রজারা প্রধানতঃ ছিল পৌত্তলিক। এইজন্য খৃষ্টানদের অকথ্য অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে খৃষ্টধর্মের সরলতা ও উদারতায় মুগ্ধ হইয়া কনস্টান্টাইনের প্রজারা দলে দলে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে।

সম্রাট কন্‌স্টান্টাইন খৃষ্টধর্মকে কেবল রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা দান করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি সকলকে উপাসনার স্বাধীনতা দেন। ক্যাথলিক যাজকদের খাজনা প্রদানের দায় হইতে তিনি অব্যাহতি দেন। দেশের মুদ্রা হইতে পৌত্তলিক মূর্তিসমূহ অপসারণ করা হয় এবং বহু খৃষ্টানকে তাহাদের হৃত সম্পত্তি ফিরাইয়া দেওয়া হয়। ৩২৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট কনস্টান্টাইন খৃষ্টান ধর্মাধিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন আহ্বান করেন।

রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা পাইয়া রোমান সাম্রাজ্যে খৃষ্টধর্মের দ্রুত প্রসার ঘটে বটে কিন্তু সারা মধ্যযুগ ব্যাপিয়া রাষ্ট্রের সহিত ধর্মাধিষ্ঠানের সম্পর্ক লইয়া যে বিরোধ চলে তাহারই বীজ বপন করেন সম্রাট কন্‌স্টান্টাইন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সম্রাট জাষ্টিনিয়ান এবং তাঁহার ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রচেষ্টা

৫২৭ খৃষ্টাব্দে পূর্ব-রোম সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন সম্রাট জাষ্টিনিয়ান। পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের সম্রাটদের মধ্যে জাষ্টিনিয়ানই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ।

জাষ্টিনিয়ান ছিলেন এক চাষী বংশের সন্তান। চল্লিশ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। সম্রাট জাষ্টিনের মৃত্যুর পর তাহার খুল্লতাত পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের সর্বময় কর্তা হন।

সম্রাট জাষ্টিনিয়ান ছিলেন ক্ষমতাশালী নরপতি। তাঁহার পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। সর্ব বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করিবার উৎসাহ ছিল তাঁহার প্রবল। স্থাপত্য, ধর্ম, আইন, অর্থশাস্ত্র এবং সঙ্গীতে তিনি সমভাবে কৌতূহলী ছিলেন। রোম সাম্রাজ্যের গৌরবময় ঐতিহ্য সম্বন্ধে তাঁহার ছিল উচ্চ ধারণা। বিজেতা, সুশাসক, নির্মাতা, আইন-প্রণেতা এবং স্থাপত্য-চিত্রশিল্পের পৃষ্ঠপোষক রূপে সম্রাট জাষ্টিনিয়ান অসামান্য খ্যাতি অর্জন করেন।



সম্রাট জাষ্টিনিয়ান

অখণ্ড রোম সাম্রাজ্যের অতীত গৌরব আবার ফিরাইয়া আনিবেন ইহাই ছিল সম্রাট জাষ্টিনিয়ানের স্বপ্ন। এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার জন্য তাঁহার চেষ্টার অন্ত ছিল না।

রাজত্বের প্রথম ভাগে পারস্যের সহিত জাষ্টিনিয়ানের একাধিক যুদ্ধ হয়। পারস্যের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামে জাষ্টিনিয়ানের সুদক্ষ সেনাপতি বেলিসেরিয়াস শেষ পর্যন্ত পারসিকগণকে তাহাদের নিজ রাজ্যের সীমান্তে বিতাড়িত করেন। ইহার পর পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যে মনোনিবেশ করিবার জন্য পারস্যের সহিত জাষ্টিনিয়ান সন্ধি করেন।

জাষ্টিনিয়ান প্রথমে বেলিসেরিয়াসের নেতৃত্বে একদল সৈন্য কার্থেজে প্রেরণ করেন এবং ভাণ্ডালদের পরাস্ত করিয়া আফ্রিকাকে নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। ইহার পর অস্ট্রোগথ্‌দের হাত হইতে ইটালী উদ্ধারের জন্য বেলিসেরিয়াস সসৈন্যে যাত্রা করেন। তিনি সিসিলি ও নেপলস অধিকার করিয়া রোমে উপনীত হন। ইহার পর তিনি রোমও অধিকার করেন। ভিসিগথ্‌দের হাত হইতে স্পেনের দক্ষিণাংশও বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

৫৪০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট জাষ্টিনিয়ান যখন ক্ষমতার তুঙ্গে তখন পারস্য পুনরায় রোমান সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। জাষ্টিনিয়ান পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া পারস্য-রাজকে যুদ্ধে পরাজিত করেন।

সম্রাট জাষ্টিনিয়ানের স্বপ্ন সম্পূর্ণ সফল হয় নাই। কেননা তিনি রোমান সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত ভিসিগথ্‌ ও ফ্রাঙ্কদের রাজ্য পুনরাধিকারের কোনও চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু তাহা সত্বেও অখণ্ড রোমান সাম্রাজ্য স্থাপনের তাঁহার প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। একদিকে পারসিকদের আক্রমণ, অন্যদিকে হূণ ও শ্লাভজাতিদের বল্কান উপত্যকায় বারবার অভিযান সম্রাটের স্বপ্নকে সফল হইতে দেয় নাই।

৫৬৫ খৃষ্টাব্দে জাষ্টিনিয়ানের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর ইটালী ও অন্যান্য বিজিত অঞ্চল পুনরায় জার্মানদের হাতে চলিয়া যায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জাষ্ঠিনিয়ানের আইনবিধি এবং স্থাপত্য শিল্পে তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা

রাজ্যজয় অপেক্ষা রোমান আইনের বিধিবদ্ধ সঙ্কলনের জন্য ইউরোপের ইতিহাসে সম্রাট জাষ্টিনিয়ান চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। সাম্রাজ্যের বিস্তার ও খৃষ্টধর্মের প্রসারের ফলে দেশে প্রচলিত আইন সমূহের সংস্কারের প্রয়োজন ছিল। তাহা ছাড়া রোমান আইন এমন বিপুল ও ব্যাপক ছিল যে উহা একত্রিত না করিলে দেশের বিচার

ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা আনয়ন করা সম্ভব ছিল না। দেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে সম্রাট জাষ্টিনিয়ান তাঁহার মন্ত্রী ত্রিবোনিয়ানের নেতৃত্বে একদল আইনজ্ঞকে দেশের সমস্ত আইন, সম্রাটদের নির্দেশনামা এবং বিচারকদের অভিমত সমূহ সঙ্কলন করিতে নির্দেশ দেন। অবশেষে অপ্রয়োজনীয় অংশসমূহ বাদ দিয়া ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ইহা 'জাষ্টিনিয়ানের আইনবিধি' নামে খ্যাত।

'জাষ্টিনিয়ানের আইনবিধি'-র গুরুত্ব কম ছিল না। ইহা প্রকাশের পর বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে রোমক আইনের ব্যাপক প্রসার ঘটে। পরবর্তী কালে এই আইনবিধিকে ভিত্তি করিয়াই পৃথিবীর নানা রাষ্ট্রের আইন কানুন রচিত হইতে থাকে। শুধু তাহাই নহে, বর্তমান যুগেও ইউরোপের প্রায় সব দেশের আইন কানুন প্রণয়নে জাষ্টিনিয়ান আইন-বিধির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

স্থাপত্য ও চিত্রশিল্পে সম্রাট জাষ্টিনিয়ানের অবদান অবিস্মরণীয়। প্রকৃতপক্ষে জাষ্টিনিয়ানের রাজত্বকাল বাইজান্টাইন শিল্প-কলার স্বর্ণযুগ।

জাষ্টিনিয়ান কনস্টান্টিনোপল, গ্রীস, এশিয়া মাইনর, মিশর, উত্তর আফ্রিকা প্রভৃতি স্থানে বহু সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা, গীর্জা, দুর্গ, সেতু, রঙ্গশালা, স্নানাগার ইত্যাদি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। কনস্টান্টিনোপলের অপরূপ শোভা ও সৌন্দর্যে মণ্ডিত রাজপ্রাসাদটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। রাজপ্রাসাদের সম্মুখে ছিল রঙ্গশালা। ইহাকে বলা হইত হিপোড্রোম। এখানে এক হাজার দর্শক একসঙ্গে বসিয়া ক্রীড়া কৌতুক দেখিতে পারিত। জাষ্টিনিয়ানের নির্মিত কনস্টান্টিনোপলে সেন্ট সোফিয়া গীর্জাটি বাইজানটাইন স্থাপত্য-শিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন। গ্রীক ও প্রাচ্য শিল্পরীতির সমন্বয়ে নির্মিত এই গীর্জাটি তখনকার শিল্পীদের দক্ষতার পরিচয় বহন করে। গীর্জাটির উচ্চতা ছিল দুইশত সত্তর ফুট এবং ভিতরের ছাদ ও বেদী ছিল স্বর্ণ-নির্মিত। গীর্জাটিতে সোনা, রূপা ও নানাবিধ পাথরের উপর অতি সূক্ষ্ম ও সুন্দর কারুকার্য ছিল। বাহিরে সূর্যের আলোয় এবং ভিতরের নানা পাথরের ঔজ্জ্বল্যে গীর্জাটি আলোয় ঝলমল করিত।

সম্রাট জাষ্টিনিয়ান চিত্রশিল্পেরও একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার সময়ে বাইজাণ্টাইন চিত্রকলা বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। প্রাসাদ ও গীর্জার দেওয়াল এবং ভিতরের ছাদ অপরূপ চিত্র সামবেশে



সেণ্ট সোফিয়া গীর্জা

শ্রীমণ্ডিত ছিল। এই সময়ে মোজাইক শিল্পে অর্থাৎ রঙ-বেরঙের পাথর বা কাঁচ সাজাইয়া নানারূপ চিত্রাঙ্কনে বাইজাণ্টাইন শিল্পীরা অসামান্য কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। বাইজাণ্টাইন চিত্রশিল্প ইটালীর চিত্র-কলার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

ঐশ্বর্য ও চাকচিক্য দিয়া চমক লাগানোই ছিল বাইজাণ্টাইন স্থাপত্য ও চিত্রকলার প্রধান লক্ষ্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্ররূপে এবং কৃষ্টির ধারকরূপে বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যের গুরুত্ব

ব্যবসা-বাণিজ্যে বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্য বিশেষ উন্নত ছিল। বিভিন্ন দেশজয়ের ফলে একদিকে যেমন ইহার এক বিশাল আন্তঃ-প্রাদেশিক বাণিজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল তেমনি ইহার বহির্বাণিজ্যও ছিল সুদূর প্রসারিত। মিশর ও লোহিত সাগরের পথে ভারতবর্ষ ও সিংহলের সহিত ইহার বাণিজ্য চলিত। এই স্থানগুলি হইতে আসিত মণিমুক্তা, গন্ধদ্রব্য ও মশলা। স্থলপথে চীনের সহিতও ইহার বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল। এখান হইতে আসিত দামী রেশমের কাপড়। কৃষ্ণসাগরের উপকূল হইতে আসিত ক্রীতদাস, পশুচর্ম ও খাদ্যশস্য এবং আবিসিনিয়া পাঠাইত নিগ্রো ক্রীতদাস, হাতির দাঁত, সোনা ও মণিমুক্তা। বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্য হইতে এই সব দেশে রপ্তানী হইত শিল্পপণ্য ও বিলাসদ্রব্য। উপযুক্ত পণ্যসামগ্রীর অভাবে বিদেশে সোনা পাঠাইয়া ইহার দেনা শোধ করিতে হইত।

জাষ্টিনিয়ানের সময়ে কয়েকজন ধর্মপ্রচারক রেশম ব্যবসা প্রচুর লাভজনক বলিয়া চীন হইতে একটি নলের মধ্যে কয়েকটি গুটিপোকার ডিম চুরি করিয়া বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যে লইয়া আসেন। তারপর এই সাম্রাজ্যে রেশম শিল্প গড়িয়া উঠে এবং এই শিল্পের ব্যবসা ছিল সরকারের একচেটিয়া।

আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যের উপকরণ ছিল বিলাসদ্রব্যসমূহ, ভোজ্য তেল, জলপাই ইত্যাদি। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ব্যবসা-বাণিজ্য অপেক্ষাকৃত কম ছিল।

বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্য ছিল কৃষ্টির ধারক এবং বাহক। পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর গ্রীক ও রোমান সভ্যতার সমন্বয়ে গড়িয়া উঠিল বাইজাণ্টাইন সভ্যতা। ইহার বাহন হইল গ্রীকভাষা ও খৃষ্টধর্ম। বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যের বিভিন্ন সহরে গ্রীক সাহিত্যের ব্যাপক চর্চা

হইত। এই সাম্রাজ্যের পণ্ডিতগণ সর্বদাই পুরাতন পাণ্ডুলিপি নকল করিতে ব্যস্ত থাকিতেন। পাণ্ডুলিপি রক্ষা এবং নকল করা ছাড়া এই সব পণ্ডিতগণ বহু অভিধান ও বিশ্বকোষ, ঐতিহাসিক গ্রন্থ, সাধুদের জীবনী, চিকিৎসা, আইন ও ধর্মীয় গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রীক কবিতার কিছু বৈশিষ্ট্য বাইজাণ্টাইন কবিতায় প্রতিফলিত হইয়াছিল। কয়েকজন বাইজাণ্টাইন সম্রাট নিজেরাই উচ্চশিক্ষিত ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন।

এথেন্সে সম্রাট জাষ্টিনিয়ান পৌত্তলিক দার্শনিক মতবাদসমূহের চর্চা নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যে গ্রীক দার্শনিক মতবাদসমূহের চর্চা অক্ষুণ্ণ ছিল। কনস্টান্টিনোপল নগরীতে ১০৪৫ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার বহু পূর্ব হইতেই এখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা হইত। এখানে সাহিত্য অলঙ্কার-শাস্ত্র, আইন ও দর্শনের পঠন-পাঠন হইত।

সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশে বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

অনুশীলনী

বাস্তব ভিত্তিক ও মৌখিক প্রশ্নাবলী

১। কে কন্স্টাণ্টিনোপল নগরীটি প্রতিষ্ঠা করেন ?

২। কত খ্রীষ্টাব্দে কনস্টাণ্টিনোপল নগরীটি প্রতিষ্ঠিত হয় ?

৩। কোন্ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট কনস্টানটাইন খ্রীষ্টান ধর্ম সম্মেলন আহ্বান করেন ?

৪। জাষ্টিনিয়ানের রাজত্বকালে ভাণ্ডালরা কোথায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল ?

৫। ত্রিবোনিয়াম কোন্ সম্রাটের মন্ত্রী ছিলেন ?

৬। কন্স্টাণ্টিনোপলের বর্তমান নাম কি ?

সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্নাবলী :—

১। পূর্ব রোম সাম্রাজ্যকে 'বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্য' বলা হইত কেন ?

২। কনস্টাণ্টিনোপল নগরীটি কে প্রতিষ্ঠা করেন ? উহা কোথায় অবস্থিত ? উহাকে 'প্রাচ্যের নূতন রোম' বলা হইত কেন ?

৩। 'জাষ্টিনিয়ানের রাজত্বকাল বাইজাণ্টাইন শিল্পকলার স্বর্ণযুগ'— আলোচনা কর।

৪। বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যে ধর্ম ব্যবস্থা কিরূপ ছিল আলোচনা কর।

৫। 'জাষ্টিনিয়ানের আইন বিধির' গুরুত্ব কি?

৬। সমর নায়করূপে বেলিসেরিয়াসের কৃতিত্ব আলোচনা কর।

৭। সেণ্ট সোফিয়া গীর্জার বর্ণনা দাও।

৮। "হিপোড্রোম" কি? এখানে কি হইত?

রচনাত্মক প্রশ্নাবলী

১। কি উদ্দেশ্যে কনস্টান্টিনোপল নগরীর প্রতিষ্ঠা হয়? ইহার ভৌগোলিক গুরুত্ব বর্ণনা কর।

২। জাষ্টিনিয়ান কে ছিলেন? তাঁহার চরিত্র ও কৃতিত্ব বর্ণনা কর।

৩। স্থাপত্য ও চিত্রশিল্পে জাষ্টিনিয়ানের অবদান বর্ণনা কর।

৪। ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্ররূপে ও কৃষ্টির ধারকরূপে বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যের গুরুত্ব আলোচনা কর।

৫। বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিবরণ দাও।

অধ্যায় ৫

ইসলাম ধর্ম ও তাহার প্রভাব

প্রথম পরিচ্ছেদ

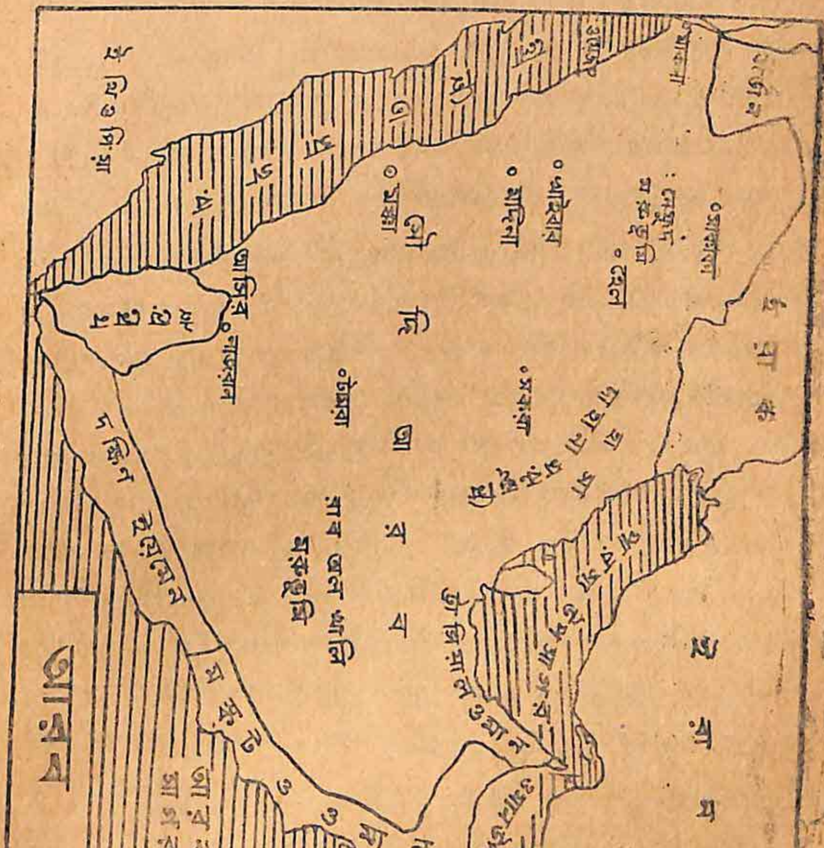
আরবদেশ ও তাহার অধিবাসী

এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে আরবদেশ। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে ভারতবর্ষে যখন সম্রাট হর্ষবর্ধন রাজত্ব করিতেছিলেন সেই সময়ে আরবে এক নূতন ধর্মের অভ্যুদয় হয়। এই ধর্মের নাম ইস্‌লাম এবং ইহার প্রবর্তক ছিলেন হজরত মহম্মদ নামে এক মহাপুরুষ।

আরব দেশঃ লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরের মধ্যবর্তী এক বিরাট মরুময় ভূখণ্ড হইল আরবদেশ। আরব ছিল একটি অনুন্নত দেশ। হজরত মহম্মদ যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন আরবীয়রা ছিল অর্ধবর্বর।

আরবের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া রহিয়াছে ধূ-ধূ বালুকাময় মরুভূমি। এখানে বৃষ্টি প্রায় হয় না। ফলে গাছপালা তৃণশস্য কিছুই

এখানে জন্মায় না বলা চলে। আরবের একমাত্র লোহিত সাগরের নিকটবর্তী অঞ্চলটি উর্বর ও কৃষিকার্যের উপযোগী। এই অঞ্চলকে ঘিরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল মক্কা, মদিনা প্রভৃতি কয়েকটি শহর। কয়েকটি মরূদ্যান, ছোট ছোট ছড়ানো কয়েকটি শহর ছাড়া আরব ভূখণ্ডের বাকী অংশে শুধু পাহাড় ও মরুভূমি।



আরবের অধিবাসী ঃ ইসলাম ধর্ম প্রবর্তনের পূর্বে আরব ছিল এক ভৌগোলিক নামমাত্র এবং ইহার অধিবাসীরা ছিল সভ্য সমাজের অপাঙক্তেয়। তাহাদের না ছিল কোন সভ্যতা, না ছিল কোন সংস্কৃতি।

শহরের অধিবাসীরা দল বাঁধিয়া উটের পিঠে পণ্যদ্রব্য বহন করিয়া দেশ-বিদেশে বাণিজ্য করিত। আরবের মরু অঞ্চলে এক শ্রেণীর লোক বাস করিত। তাহাদের বলা হইত বেদুইন। বেদুইনরা ছিল গৃহহীন যাযাবর। তাহারা সাধারণতঃ তাঁবুতে বাস করিত এবং উট বা ঘোড়ার সাহায্যে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করিত। তাহারা লম্বা ও ঢোলা পোষাক পরিত আর মাথায় পরিত এক বিশেষ ধরনের টুপি। বেদুইনদের প্রধান খাদ্য ছিল উটের দুধ ও মাংস এবং খেজুর। সামান্য মালপত্র লইয়া ব্যবসা ও পশুপালন ছিল তাদের প্রধান উপজীবিকা। উট, ঘোড়া, ভেড়া ও ছাগল ছিল তাহাদের প্রধান সম্পদ। ইহা ছাড়া, মরুপ্রান্তরে দস্যুতা ও লুঠতরাজ করাও ছিল তাহাদের অন্যতম পেশা।

বেদুইনরা নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। গোষ্ঠীগুলির মধ্যে কলহ ও রক্তপাত লাগিয়াই থাকিত। কিন্তু স্বভাবের দিক দিয়া বেদুইনরা ছিল নির্ভীক ও অতিথি-বৎসল। অতিথিদের তাহারা খুব শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত। এমন কি শত্রুও অতিথি হইলে তাহারা তাহার অনিষ্ট করিত না।

মহম্মদ যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন সে সময়ে আরবদেশ নানা কুসংস্কার ও অজ্ঞানের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। জুয়াখেলা, মদ্যপান, নরহত্যা প্রভৃতি সমাজে অবাধে চলিত। সমাজে বহুবিবাহের প্রচলন ছিল। দাস প্রথাও তখন দেশে প্রচলিত ছিল। বহু কুসংস্কার থাকিলেও কবিতা ও সঙ্গীতের উপর আরবীয়দের প্রবল অনুরাগ ছিল। আরবীয়রা কবিতা আবৃত্তি করিতে ও গান গাহিতে ভালবাসিত। তাহাদের মধ্যে গান ও কবিতা মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। কেননা লিখিবার পদ্ধতি তখনও তাহাদের মধ্যে চালু হয় নাই।

ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিবার পূর্বে আরবীয়রা ছিল পৌত্তলিক। তাহারা নানা দেবতার পূজা করিত। গাছ, পাথর গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতিকেও তাহারা কল্পিত দেবতারূপে পূজা করিত। মক্কার কাবা মন্দির ছিল আরবীয়দের প্রধান উপাসনার স্থান। এই মন্দিরে প্রায় তিন চারিশত দেবতার মূর্তি ছিল। এই মন্দিরে 'কাবা' নামে এক কাল রঙের বৃহৎ

শিলাখণ্ড রহিয়াছে। তাই এই মন্দিরের নাম কাবা মন্দির। এই শিলাখণ্ডখানি আরবীয়দের নিকট ছিল পরম শ্রদ্ধার বস্তু। শিলা খণ্ডখানি আজিও লক্ষ লক্ষ মানুষের পূজা পাইয়া আসিতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হজরত মহম্মদ ও তাঁহার বাণী

যীশুখৃষ্টের জন্মের প্রায় পাঁচশত সত্তর বৎসর পরে আরবদেশের অন্তর্গত মক্কা শহরে সম্ভ্রান্ত কোরেশ বংশে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ছিল আবদুল্লা এবং মাতার নাম আমিনা। মহম্মদের জন্মের পূর্বেই তাঁহার পিতা আবদুল্লার মৃত্যু হয়। মহম্মদের বয়স যখন ছয় বৎসর তখন তাঁহার মাতা আমিনাও ইহলোক ত্যাগ করেন। শৈশবে মহম্মদকে তাঁহার পিতামহ আবদুল মুতালেব এবং পিতৃব্য আবু তালেব পরম স্নেহে লালন-পালন করেন।

আবু তালেব ছিলেন সওদাগর। ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে তিনি সিরিয়া, দামাস্কাস, বাগদাদ, বসরা প্রভৃতি স্থানে যাইতেন। মহম্মদও তাঁহার সঙ্গে এই সকল স্থান পরিভ্রমণ করেন। বাল্যকালে মহম্মদ লেখাপড়ার কোন সুযোগ পান নাই। কিন্তু তাঁহার স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর এবং বুদ্ধি ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। নানাদেশ পরিভ্রমণের ফলে মহম্মদ ইহুদী, খৃষ্টান প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের ধর্ম ও রীতিনীতি সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিতে সক্ষম হন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে কিছু অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া উপার্জনের চেষ্টায় মহম্মদ খাদিজা নামে এক ধনী বিধবা মহিলার অধীনে কর্ম গ্রহণ করেন। অবশেষে খাদিজা মহম্মদের সাধুতায় ও কর্তব্যনিষ্ঠায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। এই বিবাহের ফলে মহম্মদের অভাব অনটন দূর হয়।

বাল্যকাল হইতেই মহম্মদ ছিলেন ধর্মপ্রবণ, ভগবানের চিন্তা করিতে তিনি ভালবাসিতেন। বিবাহের কিছুদিন পর একদিন শহর হইতে দূরে মক্কার নিকট হীরা নামে এক পর্বতের গুহায় তিনি কঠিন তপস্যায় মগ্ন হন। অবশেষে একদিন তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। তিনি

জানিলেন ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। ঈশ্বরের আদেশে মহম্মদ এই মতবাদ তাঁহার অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশে প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। মহম্মদ প্রচারিত এই মতবাদ বা ধর্ম 'ইসলাম ধর্ম' নামে পরিচিত। 'ইসলাম' কথাটির অর্থ শান্তি এবং ঈশ্বরের নিকট সম্পূর্ণআত্মসমর্পণ।

মহম্মদের প্রথম শিষ্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন তাঁহার পত্নী খাদিজা, বাল্যসখা আবুবকর, পিতৃব্যপুত্র আলি। নূতন ধর্মাবলম্বীরা ইসলাম ধর্মাবলম্বী বা মুসলমান নামে পরিচিত হইলেন।

মহম্মদ প্রচারিত নূতন ধর্ম কুসংস্কারাচ্ছন্ন আরববাসীরা সহজে মানিয়া লয় নাই। তাহারা মহম্মদের বিরুদ্ধাচরণ করিল, এমন কি তাঁহাকে হত্যা করিবারও ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। মক্কাবাসীদের অমানুষিক অত্যাচারের ফলে মহম্মদ এবং তাঁহার শিষ্যরা মক্কা ছাড়িয়া মদিনায় চলিয়া যান। মহম্মদের মক্কা হইতে মদিনা গমনের দিনটি

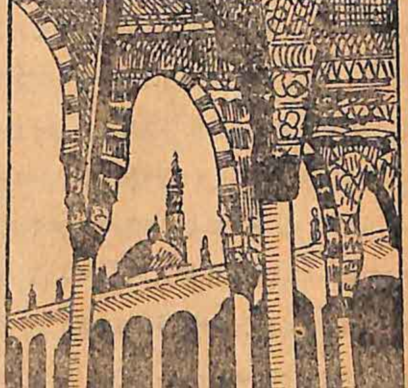


মক্কা

স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য এই দিনহইতে মুসলমানদের হিজরী অব্দের প্রচলন হয়। এই হিজরী অব্দ ৬২২ খৃষ্টাব্দ হইতে গণনা করা হয়।

মদিনাবাসীরা মহম্মদকে সাদরে গ্রহণ করিল। শুধু তাহাই নহে

তাহারা দলে দলে মহম্মদ প্রচারিত নূতন ধর্ম গ্রহণ করিল। দেখিতে দেখিতে মদিনা ইসলাম ধর্মের প্রধান কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইল। ইসলাম ধর্মের অগ্রগতিতে ভীত হইয়া মক্কাবাসীরা মদিনা অক্রমণ করিল। বাধ্য হইয়া আত্মরক্ষার জন্য মদিনার পক্ষে মহম্মদ অস্ত্রধারণ করিলেন। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে তিনি জয়ী হইলেন। ৬৩০ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ মক্কা জয় করেন। কাবার অনেক দেবমূর্তি ধ্বংস করিয়া তিনি ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয় এই মতবাদ প্রচার করিতে লাগিলেন। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া মহম্মদ পুনরায় মক্কায় ফিরিয়া আসেন এবং মক্কাবাসীদের ক্ষমা করেন। মহম্মদের দয়া ও প্রেমের মহত্বে মুগ্ধ হইয়া মক্কাবাসীরা তাঁহার প্রচারিত ধর্ম গ্রহণ করিল। এইভাবে ইসলাম ধর্ম মক্কা এবং মক্কা হইতে সমগ্র আরবে ছড়াইয়া পড়িল। আরবের বাহিরেও যেমন, চীন, পারস্য ও কনস্টান্টিনোপলের সম্রাটদিগের দরবারে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিবার জন্য মহম্মদ দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। মক্কাবাসীদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিয়া মহম্মদ পুনরায় মক্কা হইতে মদিনায় চলিয়া যান, এবং মদিনাতেই তেষট্টি বৎসর বয়সে ৬৩২ খৃষ্টাব্দে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।



মদিনা

মহম্মদের মৃত্যুর পর বৎসর তাঁহার বাণী ও উপদেশসমূহ একত্র করিয়া 'কোরান' নামক গ্রন্থে সঙ্কলন করা হয়। খৃষ্টানদের নিকট যেমন বাইবেল তেমনি মুসলমানদের নিকট এই কোরান অত্যন্ত পবিত্র গ্রন্থ। মহম্মদ প্রবর্তিত ইসলাম ধর্মের মূল কথা ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয় এবং মহম্মদ তাঁহার রসুল বা প্রতিনিধি। ঈশ্বর কোন মূর্তির মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করেন না, তাঁহাকে পাইতে

হয় অন্তরের মধ্যে। ঈশ্বরের কোন মূর্তি নাই, তাই মূর্তি পূজা ইসলামে নিষিদ্ধ। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের অবশ্য পালনীয় হইল মক্কার দিকে মুখ করিয়া প্রত্যহ পাঁচবার নামাজ পাঠ, রমজান মাসে উপবাস, মক্কায় হজ বা তীর্থ যাত্রা এবং আয়ের এক-পঞ্চমাংশ দরিদ্রকে দান। মহম্মদের প্রধান শিক্ষা ঃ সকল মানুষই ঈশ্বরের সৃষ্টি, সুতরাং মানুষে মানুষে কোন ভেদ থাকিতে পারে না, সকলেই ভাই ভাই। সব মানুষকে ভালবাসাই মানবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলামের অগ্রগতির কারণ ও খলিফাদের পরিচয়

ইসলাম ধর্ম ছিল সহজ সরল অনাড়ম্বর। এই ধর্মে কোন পুরোহিত নহে বা কোন পূজা নহে, কেবলমাত্র প্রার্থনার দ্বারা আল্লার কৃপা লাভ সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, এই ধর্ম ছিল সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ধর্মে ধনী নির্ধন সবাই ভাই ভাই। তৃতীয়তঃ, এই ধর্মে কোন জাতিভেদ বা বর্ণভেদ ছিল না। সব মুসলমান এক জাতি। চতুর্থতঃ, পরাজিত জাতি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলে বিজেতার সমান অধিকার পাইত। সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সহজ সরল ইসলাম ধর্ম আরব ও বেদুইনদের মধ্যে শীঘ্রই অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া উঠিল। শুধু তাহাই নহে, আরব জাতির মধ্যে মুসলমান এক নূতন প্রেরণার সঞ্চার করিল।

এই নূতন ধর্মীয় প্রেরণা আরবের সকল জাতি এবং উপজাতিদের ঐক্যবদ্ধ করিয়া একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করে। আরবগণ গভীর জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়। ইসলামের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হইয়া তাহারা শত্রুর বিরুদ্ধে নিজদেশ রক্ষা করা এবং ইসলামের প্রসারকল্পে অন্যদেশ জয় করা কর্তব্যকর্ম বলিয়া মনে করিল। এই উদ্দেশ্যে মৃত্যুবরণ করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া এই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ইসলামের অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিল।

ইহা ছাড়া, ইসলাম ধর্ম বিস্তারের প্রথম দিকে আরবে বহু সুদক্ষ সৈনিক ও দূরদর্শী সেনানায়কের আবির্ভাব হইয়াছিল। শুধু তাহাই

নহে, প্রথম খলিফা কয়েকজনও ছিলেন বীর ও সাহসী এবং রণনিপুণ। ইসলামের সামরিক খ্যাতি রোমান বা পারসিক সাম্রাজ্যের সামরিক খ্যাতিকেও ম্লান করিয়া দিয়াছিল। ইসলামের সেনাবাহিনীতে অশ্বারোহী ও উষ্ট্রারোহী বাহিনী একরূপ অজেয় ছিল।

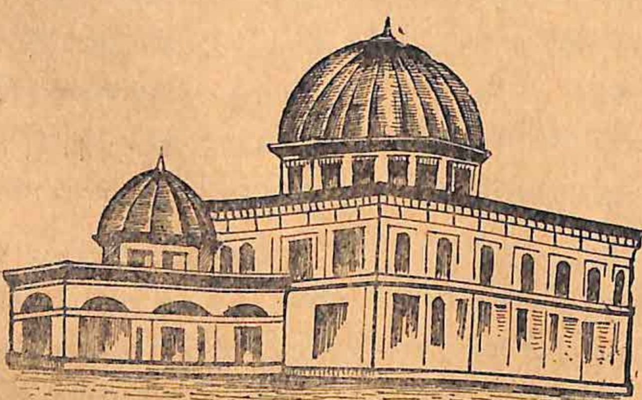
ইসলামের অগ্রগতির অন্যতম কারণ এই যে, শক্তিশালী বাইজান্টাইন ও পারস্য সাম্রাজ্য এই সময়ে পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহে হীনবল হইয়া পড়ায় ইসলাম শক্তিকে প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা ইহাদের ছিল না। তাহা ছাড়া, শাসন ও শোষণের চাপে দুই রাজ্যের প্রজারা ছিল বিক্ষুব্ধ. দীর্ঘকাল অবিরত যুদ্ধে ক্লান্ত। তাহারা শান্তির জন্য উদ্গ্রীব হইয়া উঠিল। ঠিক সময়ে ইসলাম শুনাইল তাহাদের আশার বাণী, শান্তির বাণী। বহু দূর প্রসারী এই সাম্রাজ্য দুইটির লোক দলে দলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইল। এইভাবে অপ্রতিহত গতিতে ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটিল।

খলিফা : ইসলামের দিগ্বিজয়ে নেতৃত্ব দিয়াছেন ইসলাম জগতের নেতা খলিফারা। খলিফা ছিলেন একাধারে রাষ্ট্রপ্রধান ও ধর্মগুরু। অপুত্রক মহম্মদের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রধান শিষ্য আবুবকর (৬৩২ খৃঃ—৬৩৪ খৃঃ) খলিফা পদে নির্বাচিত হন। আবুবকর ছিলেন মহম্মদের একনিষ্ঠ ভক্ত। তিনি ছিলেন পণ্ডিত ও সাধু প্রকৃতির ব্যক্তি। খলিফা হইয়াও তিনি দীন ফকিরের মত দিন যাপন করিতেন। তাঁহার সময়ে সিরিয়া এবং পূর্বে মেসোপটেমিয়া পর্যন্ত ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটে।

আবুবকরের মৃত্যুর পর খলিফা হন ওমর (৬৩৪ খৃঃ—৬৪৪ খৃঃ)। ওমর ছিলেন যেমন বীর তেমনই ধার্মিক। তিনিও আবুবকরের ন্যায় সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন। বিলাসিতা তিনি মোটেই সহ্য করিতে পারিতেন না। সেনাপতি বা উচ্চপদস্থ কর্মচারীর বিলাসিতা দেখিলে তিনি তাঁহাকে কঠোর তিরস্কার করিতেন। একবার পারস্য সম্রাটের দূত প্রত্যূষে তাঁহাকে মসজিদের সিঁড়ির উপর শুইয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন। তাঁরার সময়ে এশিয়া মাইনর,

মেসোপটেমিয়া, মিশর ও পারস্যের কিয়দংশ ইসলামের অধিকারে আসে।

ওমরের পর খলিফা হইলেন ওসমান (৬৪৪ খৃঃ—৬৫৬ খৃঃ)। ৬৫৬ খৃষ্টাব্দে ওসমান আততায়ীর হস্তে নিহত হইলে মহম্মদের জামাতা আলি খলিফা হন (৬৫৬ খৃঃ—৬৬১ খৃঃ)। আলি ছিলেন ধার্মিক, উদার ও সুপণ্ডিত। তাঁহার সময় হইতে এক সর্বনাশা গৃহবিবাদের সূত্রপাত হয়। সিরিয়ার শাসনকর্তা মোয়াবিয়া এই সময়ে খলিফার পদ অধিকার করিতে চাহেন। আলি শত্রুর চক্রান্তে প্রাণ হারাইলেন। মোয়াবিয়া এইবার খলিফা হইলেন। এই সময় হইতে খিলাফৎ বংশগত হইয়া দাঁড়াইল। এই বংশের নাম উমাইয়াদ বংশ। উমাইয়াদ বংশ ৬৬৯ খৃঃ হইতে ৭৫০ খৃঃ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিল। সরল ও পবিত্র জীবন যাপনের জন্য মহম্মদের পর চারিজন খলিফা 'সাধুখলিফা' নামে খ্যাত। আলির দুই পুত্র ছিল—হাসান ও হোসেন। মোয়াবিয়া শত্রুমুক্ত হইবার জন্য চক্রান্ত করিয়া হাসানের প্রাণনাশ করেন। ইহার পর মোয়াবিয়ার পুত্র এজিদ খলিফা হন। আলির কনিষ্ঠ পুত্র হোসেন এজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গিয়া কারবালা প্রান্তরে শত্রুর



ডোম অফ দি রক : জেরুজালেমে মোহম্মদের স্মৃতি গম্বুজ—৬৯৯ খৃষ্টাব্দ

হস্তে নিহত হন। শিয়া মুসলমানেরা কারবালা প্রান্তরের এই শোচনীয় ঘটনা স্মরণ করিয়া মহরম পর্ব পালন করেন।

হোসেনের মৃত্যুর পর মুসলমানগণ দুইটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া যায়। পারস্যদেশের মুসলমানগণ যাহারা আলির শিষ্য ছিল তাহারা 'শিয়া' নামে এবং আরবীয় ও তুর্কী মুসলমানগণ 'সুন্নী' নামে পরিচিত হন।

এজিদের মৃত্যুর পর তাঁহার বংশের বার জন পর পর খলিফা হন। অবশেষে ৭৫০ খৃষ্টাব্দে আব্বাসীয় বংশ খিলাফৎ অধিকার করেন। এই বংশ ১২৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করে। আবাস ছিলেন মহম্মদের এক কাকা। আব্বাসীয়রা ছিল তাঁহারই বংশধর। আব্বাসীয়রা খলিফাদের রাজধানী দামাস্কাস হইতে বাগদাদে স্থানান্তরিত করেন। এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ খলিফা ছিলেন হারুন-অল-রসিদ। ছদ্মবেশে পথে পথে ঘুরিয়া প্রজাদের অভাব অভিযোগের কথা নিজে শুনিয়া তিনি তাঁহার প্রতিবিধান করিতেন। তাঁহার দান, তাঁহার মহত্ত্ব এবং বিদ্যাচর্চায় তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা সর্বজনবিদিত। তাঁহার সময়ে বাগদাদ জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-শিল্পে অসামান্য খ্যাতি অর্জন করে।

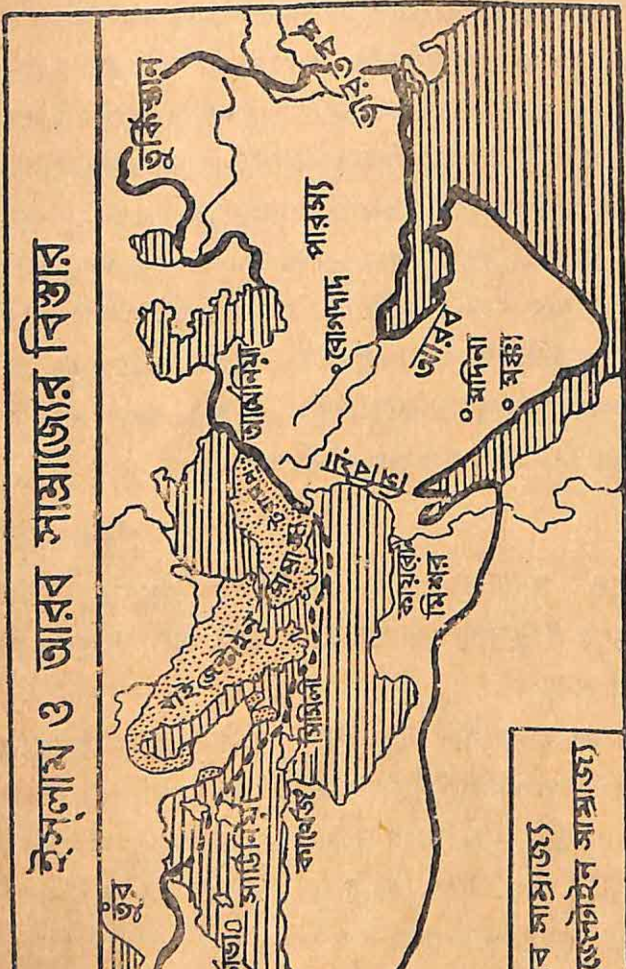
চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আরব সাম্রাজ্য ও কোর্ডোবার গুরুত্ব: ইসলামের অগ্রগতিতে ইউরোপে প্রতিক্রিয়া: কৃষ্টি, কলা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে আরবের অবদান

মহম্মদের মৃত্যুর পর প্রায় পঁচিশ বৎসরের মধ্যে আরবেরা একে একে সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন, পারস্য ও মিশর অধিকার করিয়া লয়। একশত বৎসরের মধ্যে আরব সাম্রাজ্য পূর্বে পারস্য হইতে সিন্ধুদেশ এবং পশ্চিমে মিশর, উত্তর আফ্রিকা, ত্রিপলি, টিউনিস, আলজিরিয়া, মরক্কো এবং সুদূর স্পেন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

আরবগণ স্পেন দেশে একটি রাজ্য স্থাপন করে। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল কোর্ডোবা। এই কোর্ডোবা ছিল আরবীয় সভ্যতার এক প্রধান কেন্দ্র। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় ও স্থাপত্য শিল্পে কোর্ডোবা সে সময়ে বিশেষ খ্যাতিলাভ করে। প্রাচীন ভারতের নালন্দার ন্যায় কোর্ডোবার বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশ-বিদেশ হইতে বহু ছাত্র ও পণ্ডিত

আসিতেন। এখানে ধর্ম, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, গণিতবিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র, চিকিৎসা-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইত। কোর্ডোবা নগরে বহু অবৈতনিক স্কুল ও গ্রন্থাগার ছিল।



স্থাপত্যশিল্পেও কোর্ডোবা ছিল অতুলনীয়। কোর্ডোবা নগরেই ছিল তিন হাজার আটশত মসজিদ, ষাট হাজার অট্টালিকা এবং সাত

শত স্নানাগার। সুষ্ঠু গঠনভঙ্গী ও অপূর্ব অলঙ্করণে কোর্ডোবার প্রাসাদ ও মসজিদগুলি ছিল সে যুগের স্থাপত্যকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

আরবরা স্পেন অধিকার করিয়া গলদেশে প্রবেশ করিলে তাহারা সারা ইউরোপ গ্রাস করিবার উপক্রম করে। কিন্তু ৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে ট্যুরের যুদ্ধে প্রসিদ্ধ ফ্রাঙ্ক সেনাপতি চার্লস মার্টেলের নিকট আরবরা পরাজিত হইলে খৃষ্টান ইউরোপ ইসলামের হাত হইতে রক্ষা পায়।

কৃষ্টি-কলা-জ্ঞান-বিজ্ঞানে আরবের অবদান: আরবগণ কেবলমাত্র বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করে নাই; জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্পকলায় তাহারা অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিল। প্রাচীন গ্রীক, পারসিক, ইহুদী, ভারতীয়, মিশরীয় প্রভৃতি সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আরবরা বিশেষ উন্নতিলাভ করে এবং আরও কৃষ্টি ও সভ্যতার বিকাশ ঘটে।

উমাইয়াদ বংশীয়দের শাসনকালে আরবগণ ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষালাভ করিত। এই সময়ে বসরা ও কুফা শিক্ষার দুইটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। উমাইয়াদ বংশীয় নরপতিগণ সাহিত্যচর্চায় গভীর উৎসাহী ছিলেন। তখন সু-সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক হিসাবে আবিদ ও ওয়াহাব বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। উমাইয়াদদের আমলে চিকিৎসা-শাস্ত্রও অভাবনীয় উন্নতিলাভ করিয়াছিল। খালিদ-বিন্ ইয়াজিদ এ যুগে চিকিৎসা ও রসায়নশাস্ত্রে একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম গ্রীক বিজ্ঞানকে আরবীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন।

আব্বাসীয় বংশীয়দের শাসনকালে আরবীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার চরম বিকাশ ঘটে। জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-শিল্পকলায় এই সময়ে এক নূতন যুগের সূত্রপাত হয়। আব্বাসীয় খলিফাদের দরবারে জ্ঞানী, গুণী, পণ্ডিত, সাহিত্যিক, কবি, দার্শনিক, সঙ্গীতজ্ঞ ও বিভিন্ন কলানিপুণ ব্যক্তিদের সমাবেশ দেখা যায়। বিভিন্ন দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকৃষ্ট পুস্তকাদি আরবী ভাষায় অনুবাদ করা হইয়াছিল। এই অনুবাদ

কার্যের জন্য খলিফার দরবারে এক অনুবাদক গোষ্ঠী ছিল। এই অনুবাদ কার্যে হারুণ-অল-রসিদ গ্রীক, ভারতীয়, পারসিক ও ইহুদী প্রমুখ পণ্ডিতদের সাহায্য গ্রহণ করেন। যদি আরবীয়গণ অনুবাদের মাধ্যমে এরিষ্টটল ও টলেমির গবেষণাসমূহ রক্ষা না করিতেন তাহা হইলে ইহা কবে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইত। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলায় সে সময়ে বাগদাদ ও স্পেন বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করে।

গণিত, চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতিষ, রসায়ন, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, ভূগোল, আইন, ধর্মশাস্ত্র, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে আরব পণ্ডিতগণ মৌলিক গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন। আরবদের প্রবর্তিত সংখ্যালিখন প্রণালী এখনও প্রচলিত আছে। বীজগণিত ও দশমিক সংখ্যারীতি আরবরা ভারত হইতে গ্রহণ করিয়া ইউরোপে বিস্তার করে।

চিকিৎসাশাস্ত্রে আরবদের অবদান কম নহে। চরক-সংহিতা, সুশ্রুত-সংহিতা প্রভৃতি ভারতীয় আয়ুর্বেদ গ্রন্থ আরবীতে অনূদিত হইয়াছিল। আরবদের চিকিৎসা বিজ্ঞান পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতিতে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিল। রসায়নশাস্ত্রেও আরবরা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। অনেকগুলি মৌলিক পদার্থ তাহারা আবিষ্কার করে। কুফার আবু মুসা জাফর 'আধুনিক রসায়নের জনক' বলিয়া স্বীকৃত। জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে আরবগণ ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যার প্রখ্যাত গ্রন্থ 'সূর্য সিদ্ধান্ত' অবলম্বনে মূল্যবান গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। ইতিহাস রচনায় আরবরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্তন করেন। তাহাদের ইতিহাসবোধ ছিল যথেষ্ট উন্নত। প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধার করিয়া এবং সমসাময়িক কালের নানা তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়া আরবরা বর্তমান ঐতিহাসিকদের বহু উপকার সাধন করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে বিলাহুরি, হামাদান, মাসুদি প্রভৃতি ঐতিহাসিকের নাম উল্লেখযোগ্য। আরবেরা নাবিকদের দিগ্‌দর্শন যন্ত্র আবিষ্কার করে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে জ্ঞানের সন্ধানে ও বাণিজ্য ব্যপদেশে পরিভ্রমণ করে। সাহিত্য, সঙ্গীত ও দর্শনে আরবরা সে যুগে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল।

শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞানে নহে স্থাপত্যশিল্পে নানা কারুকার্যে ও মোজাইক শিল্পে আরবরা বিশেষ দক্ষতা অর্জন করে। কর্ডোবার মসজিদ, কর্ডোবার নিকটে 'জহরা' প্রাসাদ, গ্রাণাডার 'আলহামরা' প্রাসাদ, বাগদাদের অট্টালিকাসমূহ সে যুগের স্থাপত্য ও মোজাইক শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন।

এইভাবে কৃষ্টি-কলা-জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ আরব সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিকটে আমরা নানাভাবে ঋণী।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মধ্যযুগের কয়েকজন আরবীয় মনীষী

আরবীয় পণ্ডিতদের জ্ঞানপিপাসা ছিল অপরিসীম। দুই একটি বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াই তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকিতেন না। বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানলাভে তাঁহারা আগ্রহী ছিলেন।

আরব পণ্ডিতদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন আল্‌কিন্দি, আবুসিনা, ইব্‌ন রুশদ, আলতাবারী, ইব্‌ন খালদুন, আল্‌বিরুণী, ইব্‌ন বতুতা প্রভৃতি।

আরবীয় পণ্ডিত আল্‌কিন্দি দর্শন, গণিত, জ্যোতিষ, চিকিৎসাশাস্ত্র, রাষ্ট্রনীতি, সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়ে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এই সব বিষয়ে তিনি প্রায় দুইশত গ্রন্থ রচনা করেন।

পণ্ডিত আবুসিনা কোরান, আরবী কাব্য-সাহিত্য, দর্শন, জ্যামিতি ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনিও প্রায় একশত-খানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার চিকিৎসা শাস্ত্রের গ্রন্থগুলি সে যুগে বিশেষ সমাদর লাভ করে। কর্ডোবার একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক ছিলেন ইব্‌ন রুশদ। গ্রীক দর্শন শাস্ত্রে তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। এরিস্টটলের গ্রন্থ তিনি আরবীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি কয়েকখানি চিকিৎসাশাস্ত্র ও কাব্যগ্রন্থও রচনা করেন।

আল-তাবারী ছিলেন একজন সুপ্রসিদ্ধ আরবীয় ঐতিহাসিক। তিনি কোরান গ্রন্থের একটি টীকা ও একখানি বিরাট পৃথিবীর ইতিহাস

রচনা করেন। কথিত আছে, আল-তাবারী চল্লিশ বৎসর ব্যাপী প্রতিদিন চল্লিশ পৃষ্ঠা করিয়া ইতিহাস লিখিতেন।

ইব্‌ন খাল্‌দুন ছিলেন একজন বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক। তিনিও একখানি ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটির নাম 'মকদ্দমা'। খালদুনের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল আধুনিক।

আল্‌বিরুণী ছিলেন একজন খ্যাতনামা আরবীয় পর্যটক। গজনীর সুলতান মামুদের তিনি সভাসদও ছিলেন। নানা-শাস্ত্রে ছিল তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য। দীর্ঘকাল তিনি ভারতবর্ষে বাস করিয়া ভারতীয় ভাষা, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতিতে গভীর জ্ঞান অর্জন করিয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একখানি মনোজ্ঞ গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থটির নাম 'কেতাব্‌-উল্‌-হিন্দ্'। এই গ্রন্থটিতে খৃষ্টীয় একাদশ শতকের হিন্দুদের সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্ম, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, আইন-কানুন প্রভৃতির বহু তথ্য পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া আল্‌বিরুণী গণিত, জ্যোতিষ, বিজ্ঞান, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়েও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

আল্‌বিরুণীর ন্যায় ইব্‌ন বতুতাও ছিলেন একজন আফ্রিকাবাসী পর্যটক। দিল্লীর সুলতান মহম্মদ-বিন-তুঘলকের শাসনকালে তিনি দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে বাস করেন। মহম্মদ-বিন-তুঘলক তাঁহাকে কাজীর পদে নিযুক্ত করেন। পরে সুলতানের দূতরূপে তিনি চীনদেশে গমন করেন। পারস্য, আরব, পূর্ব আফ্রিকা, সুমাত্রা, বুখারা, আফগানিস্তান এবং স্পেনদেশেও তিনি ভ্রমণ করেন। তিনি এক অপূর্ব ভ্রমণ কাহিনী রচনা করেন। এই গ্রন্থটির নাম 'কেতাব উল্‌স্ রাহেলা'। এই গ্রন্থ পাঠে তৎকালীন ভারতবর্ষের বহু মূল্যবান তথ্য জানা যায়।

অনুশীলনী

বাস্তবভিত্তিক ও মৌখিক প্রশ্নাবলী

১। আরব দেশের অবস্থান কোথায়? ২। ইস্‌লাম ধর্মের প্রবর্তক কে? ৩। আরবের উত্তর পশ্চিমাংশে কোন্ সভ্যতার কেন্দ্র ছিল? ৪। হজরত মহম্মদ কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করেন? ৫। মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থের নাম কি? ৬। চার্লস মার্টল কোন্ দেশের সেনাপতি ছিলেন? ৭। খ্রীষ্টধর্মের কত বৎসর পরে ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হয়? ৮। 'ইসলাম' কথাটির অর্থ কি? ৯। কোন্ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ মক্কা জয় করেন? ১০। কোন্ সময় হইতে খিলাফৎ বংশগত হয়? ১১। আলবিরুণী কোন্ সুলতানের সভাসদ ছিলেন? ১২। ইব্‌ন বতুতা কোন্ সুলতানের শাসনকালে ভারতবর্ষে আসেন? ১৩। কোন্ খ্রীষ্টাব্দ হইতে হিজরী অব্দ গণনা করা হয়? ১৪। আবুবকরের পর কে খলিফা হন? ১৫। আরববাসীর খলিফাদের রাজধানী কোথায় ছিল? ১৬। 'আধুনিক রসায়নের জনক' কাহাকে বলা হয়? ১৭। 'কেতাব্-উল্-হিন্দ' গ্রন্থটি কে রচনা করিয়াছিলেন?

সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্নাবলী

১। আরবদেশের ভৌগোলিক বিবরণ দাও। ২। মহম্মদের পূর্ববর্তী আরব ও বেদুইনদের জীবনযাত্রা বর্ণনা কর। ৩। হজরত মহম্মদের প্রচারিত ইসলাম ধর্মের মূলকথাগুলি কি? ৪। 'খলিফা' কাহাকে বলে? 'সাধু খলিফা' কাহাদের বলা হয়? তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

রচনাত্মক প্রশ্নাবলী

১। মহম্মদের পূর্ববর্তী আরবে ধর্মব্যবস্থা কিরূপ ছিল? হজরত মহম্মদ প্রচারিত ধর্ম আরববাসীদের উপর কিরূপ প্রতিক্রিয়া করিয়াছিল?

২। ইসলাম ধর্মের অগ্রগতির কারণগুলি বর্ণনা কর।

৩। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প সংস্কৃতিতে আরবদের অবদান বর্ণনা কর।

৪। মধ্যযুগে কয়েকজন আরব মনীষীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

অধ্যায় ৬

মধ্যযুগের পশ্চিম ইউরোপ

প্রথম পরিচ্ছেদ

শার্লম্যান—তাঁহার রাজ্যজয় ও কৃতিত্ব

যে সকল বর্বর জাতির আক্রমণে পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে ফ্রাঙ্করা ছিল অন্যতম। বর্তমান ফ্রান্স ও জার্মানীর কিয়দংশ লইয়া তাহারা রাজ্য স্থাপন করে। খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের প্রথম ভাগে ফ্রাঙ্ক রাজাদের দুর্বলতার সুযোগে পিপিন নামে এক রাজকর্মচারী রাজাকে অপসারিত করিয়া নিজে রাজা হন। এই সঙ্গে ফ্রাঙ্কদের মেরোভিঞ্জিয়ান বংশের শাসন শেষ হয়, শুরু হয় কেরোলিঞ্জিয়ান বংশের শাসন।

পিপিনের পুত্র শার্লম্যান বা চার্লস দি গ্রেট (৭৬৮ খৃঃ—৮১৪ খৃঃ) ছিলেন ফ্রাঙ্ক রাজাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান। শার্লম্যানের সঙ্গী ও জীবনচরিতকার এজিনহার্ড শার্লম্যানের এক জীবনী লিখিয়া গিয়াছেন। এই জীবনী হইতে জানা যায় যে, শার্লম্যান দেখিতে অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন। তিনি ছিলেন দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠ। তাঁহার দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। তিনি ছিলেন অসাধারণ শক্তিশালী। তরবারির এক আঘাতে অশ্বারোহী-সহ অশ্বকে তিনি ধরাশায়ী করিতে পারিতেন। আহারে ও পোষাকে তিনি ছিলেন খাঁটি ফ্রাঙ্ক। তিনি ফ্রাঙ্কদের লম্বা ঝুলের পোষাক পরিতেন। অল্প ঝুলের পোষাক পরা সভাসদদের তিনি ব্যঙ্গ করিতেন।



শার্লম্যান

শার্লম্যান নিজে ছিলেন খুব পরিশ্রমী। অন্যদের আলস্য দেখিলে তিনি ক্রুদ্ধ হইতেন। শিকার করা, সাঁতার কাটা ও ঘোড়ায় চড়া ছিল তাঁহার শখ। তিনি প্রচুর খাইতে পারিতেন।

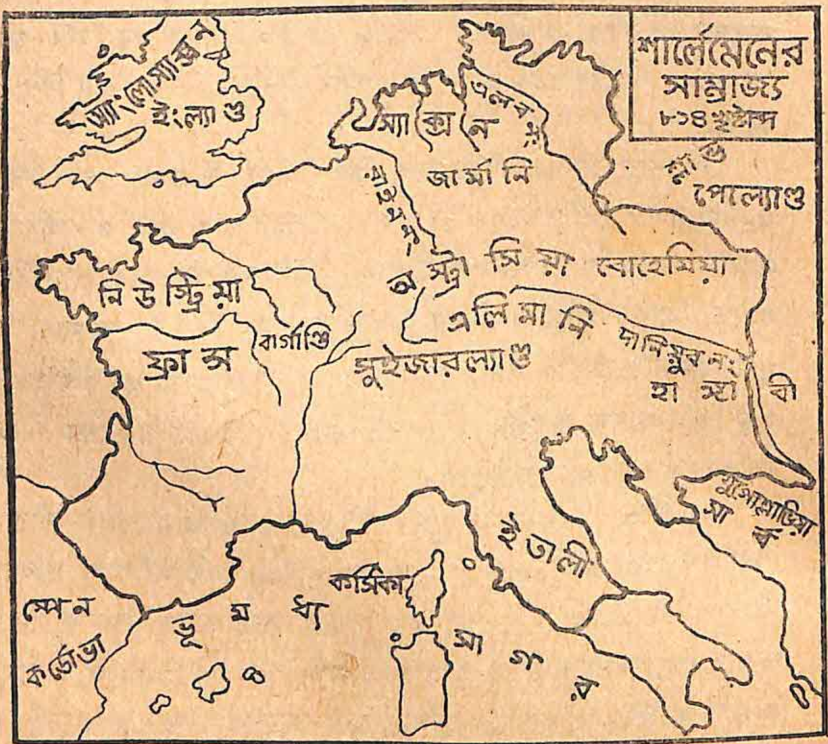
শার্লম্যান ছিলেন খুব পরিহাসপ্রিয়। অনুচরদের সহিত তিনি অবাধ মেলামেশা করিতেন, ঠাট্টা-তামাসা করিতেন। মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন একেবারে সহজ সরল। সাধারণ প্রজাদের কথা তিনি মনযোগ সহকারে শুনিতেন। সম্ভ্রান্ত দাম্ভিক লোকেদের তিনি জব্দ করিতেন। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন—এই নীতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন।

লেখাপড়া বিষয়ে শার্লম্যানের ছিল প্রবল আগ্রহ। সব কিছু জানিয়া লইতে তিনি ছিলেন উদ্‌গ্রীব। নিজের ভাষা ছাড়াও শার্লম্যান ল্যাটিন ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ব্যাকরণ, ইতিহাস, জ্যোতিষ, সঙ্গীত, আইন প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার অনুরাগ ছিল। ব্যাকরণ ও খৃষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। হাতের লেখা সুন্দর করিবার জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেন; এমন কি তাঁহার বালিশের নীচে তিনি লেখার সরঞ্জাম রাখিতেন।

শার্লম্যান ছিলেন মধ্যযুগের ইউরোপের একজন শ্রেষ্ঠ বীর। বিয়াল্লিশ বৎসর রাজত্বকালের মধ্যে পঞ্চাশটিরও বেশী অভিযান করিয়া তিনি পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলেন। তাঁহার সময়ে বর্তমান ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, সুইজারল্যাণ্ড, স্পেন, জার্মানী ও ইটালীর উত্তরাংশ জুড়িয়া ফ্রাঙ্ক সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করে। শার্লম্যানের সামরিক অভিযানসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ছিল তাঁহার স্প্যানিস যুদ্ধ। স্পেন তখন আরবদের অধিকারে ছিল। স্পেন হইতে ফিরিবার পথে পিরিনিজ পর্বতমালার এক সংকীর্ণ গিরিপথে গ্যাস্কন নামে এক পার্বত্য উপজাতি শার্লম্যানের সৈন্যদের ঘিরিয়া ফেলে। শার্লম্যানের সেনাবাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন রোলাণ্ড। রোলাণ্ড বীরের মত যুদ্ধ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেন। শার্লম্যান পরে গ্যাস্কনদের দমন করেন। শার্লম্যান ও রোলাণ্ডের বীরত্ব কাহিনী

'রোলাণ্ডের গীতি' লোকগাথায় অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে। মধ্যযুগে ইউরোপে চারণেরা এই গীতি গ্রামে গ্রামে গাহিয়া বেড়াইত।

শার্লম্যান তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যে দৃঢ় শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার লক্ষ্য ছিল দেশের অরাজকতা দূর করিয়া শান্তি স্থাপন করা এবং বিশাল সাম্রাজ্যের সকল জাতিকে ধর্ম ও সংস্কৃতির ঐক্যবন্ধনে বাঁধিয়া খৃষ্টান রাজ্য রক্ষা করা। জার্মানীর অর্ধসভ্য স্যাক্সন জাতি ছিল বড়ই



দুর্দান্ত, খৃষ্টধর্মের ঘোর বিরোধী ছিল তাহারা। একবার শার্লম্যান চারি হাজার স্যাক্সনকে নির্মমভাবে হত্যা করিয়া তাহাদের দমন করেন। শেষ পর্যন্ত তাহারা শার্লম্যানের বশ্যতা স্বীকার করে এবং খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে। পূর্ব-ইউরোপের অনেক উপজাতিকে শার্লম্যান বলপূর্বক খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন। এইসব উপজাতিদের উন্নতির জন্যও তিনি নানাবিধ চেষ্টা করেন। বহু গীর্জা ও মঠ স্থাপন করিয়া এবং বিভিন্ন দেশে প্রচারক

পাঠাইয়া খৃষ্টধর্ম প্রসারে তিনি অভাবনীয় সহায়তা করেন। তিনি বহু পথঘাট ও সেতু নির্মাণ করেন। জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া জমি উদ্ধার করিয়া তিনি কৃষির উন্নতিসাধন করেন। বাণিজ্যের সুবিধার জন্য শার্লম্যান রাইন হইতে ডানিয়ুব নদী দুইটির সংযোগকারী খাল খনন আরম্ভ করেন। তাঁহার এই পরিকল্পনা অবশ্য শেষ পর্যন্ত বাস্তবে রূপায়িত হয় নাই।

শার্লম্যান প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন; মধ্যযুগে অপর কোন ইউরোপীয় নরপতি এত বিস্তৃত ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারেন নাই। বাগদাদের খলিফা হারুন-অল্-রসিদ শার্লম্যানের দরবারে একটি অদ্ভুত ঘড়ি ও একটি হাতি উপহার পাঠাইয়াছিলেন। প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করিয়া এবং রাজ্যের সকল বর্বর জাতিকেঐক্যবদ্ধ করিয়া মধ্যযুগের ইউরোপে শার্লম্যান চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন।

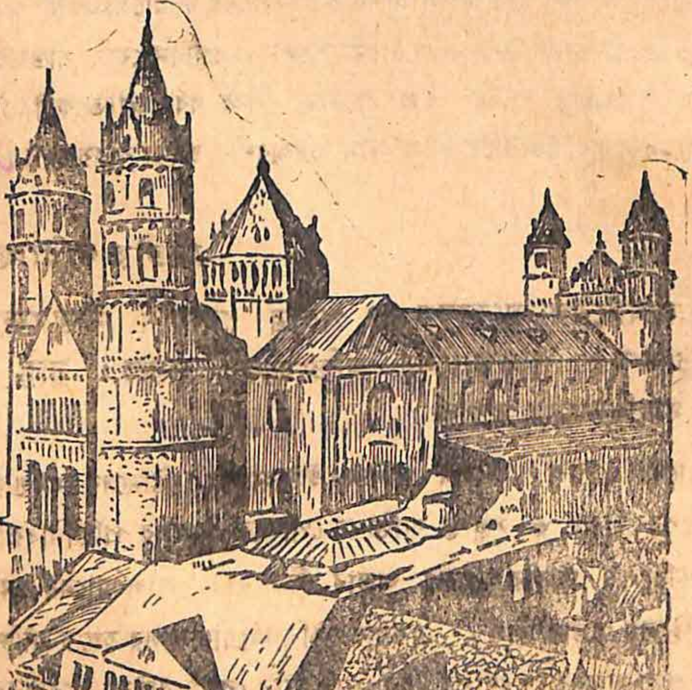
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শার্লম্যানের অভিষেক ও পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের পুনরভ্যুত্থানঃ শার্লম্যানের অভিষেকের গুরুত্বঃ রাষ্ট্র ও খৃষ্টান ধর্মাধিষ্ঠানের সম্পর্ক

রোমের পোপ ছিলেন পশ্চিম ইউরোপের খৃষ্টানদের ধর্মগুরু। ইউরোপের রাজা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ পোপকে ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে মান্য করিলেও তাঁহার শত্রুর অভাব ছিল না। শার্লম্যানের সময়ে পোপ ছিলেন তৃতীয় লিও। একবার তিনি বিরোধীদলের হাতে লাঞ্ছিত হইয়া শার্লম্যানের শরণাপন্ন হন, শার্লম্যান রোমে যাইয়া বিরোধীদের শাস্তি দিয়া পোপকে নিজ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। পোপ এই উপকারের কথা কখনও বিস্মৃত হন নাই।

একবার শার্লম্যান রোম পরিভ্রমণে আসেন। ৮০০ খৃষ্টাব্দে রোমের সেণ্ট পিটার গীর্জায় বড়দিনের উৎসব শার্লম্যান পুত্রদের লইয়া নতজানু হইয়া প্রার্থনা করিতেছিলেন; এমন সময়ে পোপ তৃতীয় লিও

শার্লম্যানের মস্তকে এক রাজমুকুট স্থাপন করেন। এই ঘটনায় অভিভূত হইয়া গীর্জায় উপস্থিত ব্যক্তিগণ উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিলেন, 'মহামহিমান্বিত রোম সম্রাট চার্লস অগস্টাসের জয়'। এইভাবে পোপ শার্লম্যানকে রোম সম্রাটরূপে অভিষিক্ত করেন এবং সেইদিন হইতে শার্লম্যানের সাম্রাজ্য 'পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য' (Holy Roman Empire) নামে অভিহিত হয়। এই ঘটনার পর কনস্টান্টিনোপলের পূর্ব সাম্রাজ্যের মর্যাদা হ্রাস পাইল এবং জনসাধারণের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হইল যে প্রাচীন রোমান সাম্রাজের পুনর্জন্ম হইয়াছে। প্রাচীন



সেন্টপিটার গীর্জা

রোমান সাম্রাজ্যের সহিত শার্লম্যানের 'পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের' কোন সম্পর্ক ছিল না। শার্লম্যানের 'পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য' ছিল ফ্রাঙ্কদের প্রতিষ্ঠিত এক রাজ্য। আয়তন বা জাতীয় চরিত্রে ইহা পূর্বের রোমান সাম্রাজ্যের সমকক্ষ ছিল না। এই সাম্রাজ্য না ছিল রোমান,

না ছিল পবিত্র, না ছিল সাম্রাজ্য। আসলে ইহা একটি বৃহৎ জার্মান রাজ্য ছাড়া আর কিছুই ছিল না। বলিতে পারা যায়, ফ্রাঙ্ক রাজ্যের নূতন নামকরণ হইল 'পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য'—ইহার বেশী কিছু নহে।

৮০০ খৃষ্টাব্দে ফ্রাঙ্ক নরপতি শার্লম্যানের পোপ কর্তৃক অভিষেক মধ্যযুগের ইউরোপে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

প্রথমতঃ, পোপ শার্লম্যানকে রাজমুকুট পরাইয়া সম্রাট পদে অভিষিক্ত করিয়া রাষ্ট্রের উপর পোপের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলেন।

দ্বিতীয়তঃ, সারা মধ্যযুগ ব্যাপিয়া রাষ্ট্রের সহিত পোপের যে বিরোধ দেখা দিয়াছিল তাহার সূত্রপাত হইল এই অভিষেক উৎসবে।

তৃতীয়তঃ, শার্লম্যানের অভিষেকের পর পশ্চিম ইউরোপের সমস্ত খৃষ্টান রাজ্যগুলি এক সম্রাটের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হইল। ফলে সারা রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন সহজ হইল।

চতুর্থতঃ, এই অভিষেকে জার্মান জাতির মর্যাদা বৃদ্ধি পাইল এবং রোমানরা পুরাতন রোম সাম্রাজ্যের পুনরভ্যুত্থান হইতেছে এই বিশ্বাসে একজন জার্মান নরপতিকে তাহাদের সম্রাট বলিয়া গ্রহণ করিলেন।

শার্লম্যান ছিলেন ন্যায়নিষ্ঠ খৃষ্টান এবং খৃষ্টধর্মের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক। তিনি মনে করিতেন ভগবানের দয়ায় তিনি রাষ্ট্র ও জনগণের সর্বসময় কর্তা। পোপ কর্তৃক অভিষিক্ত হইলেও তিনি রাষ্ট্রের উপর পোপের কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়া লইতে পারেন নাই। এই অভিষেক ব্যাপারে তিনি তাঁহার সঙ্গী ঐতিহাসিক এজিনহার্ডের নিকট অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। শার্লম্যান মনে করিতেম, পোপ তাঁহার একজন কর্মচারী এবং খৃষ্টান ধর্মাধিষ্ঠান তাঁহার শাসনের একটি বিভাগ। তিনি সকলকে মনে করাইয়া দিয়াছিলেন যে, তাঁহার সাম্রাজ্য রোমান ও পবিত্র; এবং এই পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের উৎস তিনি। সুতরাং তিনি রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা। তিনি বিশ্বাস করিতেন তিনি রাষ্ট্রের প্রভু, পোপের প্রভু এবং খৃষ্টান ধর্মাধিষ্ঠানের প্রভু। ফলে তিনি রাষ্ট্রের বিশপদের মনোনীত করিতেন এবং খৃষ্টান ধর্মাধিষ্ঠানসমূহের

শাসন ও নিয়ম-কানুন প্রবর্তনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতেন। ধর্মাধিষ্ঠানের নানা ব্যাপারে তিনি পোপকে নির্দেশও দিতেন। অপরপক্ষে পোপ মনে করিতেন তিনি আধ্যাত্মিক জগতের কর্তা এবং রাজা পার্থিব জগতের কর্তা, অতএব পোপের উপর রাজার কর্তৃত্ব থাকিতে পারে না। শার্লম্যানের মৃত্যুর পর জার্মান রাজা ও পোপ—ইঁহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠতর—এই প্রশ্ন লইয়া দীর্ঘকাল বিবাদ চলিয়াছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শার্লম্যানের রাজসভা এবং সাহিত্য ও শিল্পে তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা

সম্রাট শার্লম্যান নিজে ছিলেন বিদ্যানুরাগী ও বিদ্যোৎসাহী। জ্ঞান-বিদ্যা চর্চার পৃষ্ঠপোষক হিসাবে তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। তাঁহার রাজসভায় বহু জ্ঞানীগুণী ব্যক্তির সমাবেশ হইয়াছিল। ফ্রাঙ্কদের মধ্যে জ্ঞানীগুণী ব্যক্তির অভাব দেখিয়া শার্লম্যান দূর-দূরান্ত হইতে পণ্ডিত ব্যক্তিদের তাঁহার রাজসভায় আমন্ত্রণ জানাইতেন। ইটালীর সুপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ পিটার এবং ঐতিহাসিক পল দি ডেকন, স্পেনের কবি থিওডাল্ফ এবং ইয়র্কের এ্যালকুইন প্রভৃতি মনীষী তাঁহার রাজসভা অলংকৃত করেন। ইহা ছাড়া, পণ্ডিত এজিনহার্ড ছিলেন তাঁহার নিত্যসঙ্গী। এই সব পণ্ডিতদের মধ্যে ইংরাজ পণ্ডিত এ্যালকুইন ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। ডেন জলদস্যুরা ইংলণ্ড আক্রমণ করিলে এ্যালকুইন ইংলণ্ড ছাড়িয়া শার্লম্যানের দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সম্রাটের প্রধান উপদেষ্টারূপে নিযুক্ত হন।

এ্যালকুইনের পরামর্শে শার্লম্যান রাজ্যের নানাস্থানে বহু বিদ্যালয় ও মঠ স্থাপন করেন। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। রাজপুরীতে এ্যালকুইনের তত্ত্বাবধানে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই বিদ্যালয়ে শার্লম্যান তাঁহার পুত্রদের ও পরিষদবর্গকে লইয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেন। রাজধানীতে বিদ্যাচর্চার জন্য একটি পরিষদ গঠন করা হয়। সম্রাটের নির্দেশে এই পরিষদ বহু পাণ্ডুলিপি নকল

করে, ল্যাটিন ও জার্মান ব্যাকরণ, ইতিহাস, জীবনচরিত, ফ্রাঙ্কদের লোকগাথা প্রভৃতি সঙ্কলনের ব্যবস্থা করে এবং বাইবেল শুদ্ধভাবে পুনর্লিখনে উদ্যোগী হয়।

শার্লম্যান ছিলেন সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষক। তাঁহারই পৃষ্ঠপোষকতায় পণ্ডিত এ্যালকুইন কথোপকথনের ভঙ্গীতে ব্যাকরণ, অলঙ্কার এবং ভাষাতত্ত্বের বহু গ্রন্থ রচনা করেন।

স্থাপত্যশিল্পের পৃষ্ঠপোষকরূপেও শার্লম্যান বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। রোমের অতীত কীর্তি ফিরাইয়া আনিবার জন্য তাঁহার চেষ্টার অন্ত ছিল না। রাইন নদীর তীরে তিনি স্থাপন করিলেন তাঁহার রাজধানী এ্যাকেন নগরী। এখানে সুদক্ষ শিল্পীরা নির্মাণ করিল মনোহর রাজপ্রাসাদ, গীর্জা, মণ্ডপ ও স্নানাগার। অপরূপ শোভা ও সমৃদ্ধিতে সুসজ্জিত এ্যাকেন নগরীকে লোকে বলিত নবীন রোম। বাইজেনটিয়াম ও রোমের মোজাইক শিল্পে অলংকৃত এ্যাকেনের রাজপ্রাসাদ ছিল সে যুগের স্থাপত্যকলার উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

রোমের পতনের পর হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী কালের মধ্যে নব্য রোম সাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা শার্লম্যান ছিলেন মধ্যযুগের ইউরোপের সভ্যতা ও সংস্কৃতির উজ্জ্বল দীপবর্তিকা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মধ্যযুগের পশ্চিম ইউরোপের মঠসমূহ

খৃষ্টীয় অষ্টম শতক হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে ইউরোপের অধিকাংশ লোকই খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে। ইউরোপের জনগণ ছিল ধর্মভীরু। তাহারা খৃষ্টান ধর্মযাজকদের খুবই ভক্তি-শ্রদ্ধা করিত। তাহা-ছাড়া, যাজকগণই ছিলেন একমাত্র শিক্ষিত সম্প্রদায়। সেই কারণে লোকে তাঁহাদের যথেষ্ট সম্মান করিত। কি গ্রামে কি শহরে খৃষ্টান যাজকদের ক্ষমতা ছিল অপরিসীম।

খৃষ্টান যাজকদের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন রোমের বিশপ। তাঁহাকে বলা হইত পোপ। পোপ ছিলেন সারাদেশের ধর্মগুরু। তাঁহার ক্ষমতাও ছিল প্রচুর। তিনি ইচ্ছা করিলে পশ্চিম ইউরোপের যে

কোনও নরপতিকে বিধর্মী আখ্যা দিয়া সিংহাসনচ্যুত করিতে পারিতেন। পোপের অধীনে ছিলেন বিশপগণ। প্রত্যেক জেলায় বা কোন অঞ্চলের প্রধান যাজককে বলা হইত বিশপ। জেলার বা অঞ্চলের অধিবাসীদের ধর্মীয় জীবনের দায়িত্ব ছিল বিশপদের উপর। গ্রামে ছিলেন পুরোহিত। এই পুরোহিত গ্রামবাসীদের ধর্মকার্যে সহায়তা করিতেন। প্রতি রবিবার সমবেত প্রার্থনা পরিচালনা করা, উৎসব পালন করা, দীক্ষা দেওয়া, পাপীর প্রায়শ্চিত্ত বিধান করা প্রভৃতি ছিল যাজকদের কাজ। ইহা ছাড়া নামকরণ, বিবাহ, পারলৌকিক কাজ প্রভৃতিতে তাঁহাদের দরকার হইত।

খৃষ্টান যাজকদের মধ্যে একদল ছিলেন 'মঙ্ক' বা সন্ন্যাসী। এই শ্রেণীর যাজকেরা মঠে থাকিয়া জপতপ ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। মঠের অধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে তাঁহাদের থাকিতে হইত। মঠের অধ্যক্ষকে বলা হইত 'এ্যাবট'। অনেক স্ত্রীলোকও মঙ্কদের ন্যায় সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করিতেন। তাঁহাদের বলা হইত 'নান্' বা সন্ন্যাসিনী। সন্ন্যাসিনীদের থাকিবার জন্য পৃথক মঠ ছিল। এই মঠকে বলা হইত 'নানারি' এবং ইহার অধ্যক্ষকে বলা হইত 'এ্যাবেস'। প্রত্যেক মঠের নিজস্ব নিয়মাবলী ছিল। এই নিয়মগুলি সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনীদের কঠোর ভাবে পালন করিতে হইত।



মঠ ও সন্ন্যাসী

ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইটালীর সেণ্ট বেনিডিক্ট মঠের সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনীদের জন্য যে নিয়মবিধি করিয়া গিয়াছিলেন তাহা মঠবাসীর পক্ষে অবশ্য পালনীয় ছিল। যেমন, মঠের

প্রত্যেক সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনী হইবেন নম্র ও বিনয়ী। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহারা হইবেন আদেশানুবর্তী অর্থাৎ মঠাধ্যক্ষের আদেশ তাঁহারা মানিয়া চলিবেন, পোপের বাধ্য হইবেন। তৃতীয়তঃ, বৈরাগ্য হইবে তাঁহাদের জীবনের ব্রত। কোন ধন-সম্পত্তি বা উপঢৌকন তাঁহারা গ্রহণ করিবেন না, দীনভাবে নিরাসক্ত জীবন যাপন করিবেন। চতুর্থতঃ, কোন মঠবাসী বিবাহ বা সংসার করিবেন না, আহারে বিহারে ও বাক্যে সংযমী হইবেন, ধর্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করিবেন। ইহা ছাড়া মঠের যাবতীয় কার্য তাঁহাদেরই নির্বাহ করিতে হইত এবং মঠের নিয়মাবলী ভঙ্গ করিলে তাঁহাদের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত।

কোন কোন মঠের সন্ন্যাসীরা নানাস্থানে ঘুরিয়া খৃষ্টধর্ম ও তাহার নীতি প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহাদের বলা হইত 'ফ্রায়ার'। তাঁহারা শুধু ধর্মপ্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী অঞ্চলে তাঁহারা দুঃস্থের সেবা করিতেন এবং এমন কি যুদ্ধক্ষেত্রেও তাঁহারা আহতদের শুশ্রূষা করিতেন।

সেকালে রোগীর চিকিৎসা ও ঔষধ-পথ্যাদির ব্যবস্থা করা, আর্ত, দুঃস্থ ও নিরাশ্রয়দের সাহায্য করা, গরীব লোকদের ভিক্ষা দেওয়া প্রভৃতি জনহিতকর কার্যে খৃষ্টান যাজকরা আত্মনিয়োগ করিতেন।

মধ্যযুগে ইউরোপে গীর্জা ও মঠগুলি ছিল প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র এবং শিক্ষাদীক্ষার ভার ছিল খৃষ্টান যাজকদের হাতে। মঠের সন্ন্যাসীরাই জ্ঞান-বিদ্যার চর্চা করিয়া বড় বড় বিদ্যাপীঠের সূচনা করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া, তখনকার অরাজকতা ও যুদ্ধবিগ্রহে ধ্বংসের হাত হইতে অনেক প্রাচীন পুঁথি মঠগুলির আশ্রয়ে রক্ষা পাইয়াছিল।

কালক্রমে এই মঠগুলি তাহাদের আদর্শ রক্ষা করিতে পারে নাই। খৃষ্টান যাজকরা ক্রমশঃ দুর্নীতিগ্রস্ত হইয়া পড়েন। অর্থসম্পদে ভুলিয়া তাঁহারা আদর্শচ্যুত হইয়া ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত হন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ক্লুনির সংস্কার

খৃষ্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীতে ক্লুনি নামক এক মঠ হইতে যে ধর্মসংস্কার আন্দোলন উদ্ভূত হইয়াছিল মধ্যযুগের ইতিহাসে তাহা 'ক্লুনির সংস্কার আন্দোলন' নামে খ্যাত। সমগ্র ইউরোপের খৃষ্টান ধর্মাধিষ্ঠানসমূহকে সামন্ত প্রথার বন্ধন, সকল প্রকার পার্থিব নিয়ন্ত্রণ এবং নৈতিক অধঃপতন ও বিশৃঙ্খলা হইতে মুক্ত করিয়া সেখানে নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাই ছিল ক্লুনির সংস্কার আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

সামন্ত প্রথার উদ্ভবে খৃষ্টান ধর্মাধিষ্ঠানসমূহ সামন্তদের নিয়ন্ত্রণে আসিবার ফলে ধর্মীয় ক্ষেত্রে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। বহুক্ষেত্রে খৃষ্টান ধর্মাধিষ্ঠানসমূহ রাজা বা সামন্তদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছিল এবং এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান হইতে মোট টাকা আয়ের ব্যবস্থা হইয়াছিল। ইহার ফলে খৃষ্টান ধর্মাধিষ্ঠানসমূহে নিয়মানুবর্তিতা শিথিল হইয়া পড়ে এবং বহু যাজকদের নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন ঘটে। ইহারই প্রতিকার স্বরূপ ক্লুনির সংস্কার প্রবর্তিত হয়।

আনুমানিক ৯১০ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম নামে এক ডিউক বার্গাণ্ডী উপত্যকায় ক্লুনির মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। উইলিয়ম ক্লুনির মঠকে স্বীয় কর্তৃত্ব হইতে মুক্ত করিয়া এবং কোন বিশপের অধীনে ইহাকে না রাখিয়া পোপের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে স্থাপন করেন। সুতরাং প্রথম হইতেই এই মঠটি সামন্ত প্রথার বন্ধন হইতে এবং রাষ্ট্র বা ধর্মাধিষ্ঠানের কোন শাখার নিয়ন্ত্রণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল।

ক্লুনি বহু পুরাতন মঠসমূহের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করিয়া এবং বহু নূতন মঠ স্থাপন করিয়া এক নূতন ধরনের ধর্মীয় সংগঠনের সূত্রপাত করে। এই ধর্মীয় পুনর্গঠন ব্যবস্থায় কতকগুলি সংস্কার প্রবর্তিত হয়। এই ব্যবস্থায় ক্লুনির অধীন সকল ধর্মাধিষ্ঠানের সর্বপ্রধান হিসাবে ক্লুনিমঠে একজন এ্যাবট নিযুক্ত হইলেন এবং তিনি তাঁহার অধীনস্থ

সকল ধর্মাধিষ্ঠানের জন্য আইন-কানুন প্রণয়ন করিতেন। ক্লুনি পরিচালিত অন্যান্য ধর্মাধিষ্ঠানসমূহের প্রধানগণ 'প্রায়র' নামে অভিহিত হইলেন। এই প্রায়রগণ ক্লুনিতে অনুষ্ঠিত সভাসমূহে উপস্থিত থাকিয়া নিজ নিজ মঠ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ লাভ করিতেন। সুতরাং ক্লুনির পদ্ধতি ছিল কেন্দ্রীভূত।

পূর্বে পল্লী অঞ্চলের যাজকগণ ম্যানরের সামন্ত কর্তৃক এবং বিশপ ও আর্চবিশপগণ রাজা কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন। কিন্তু ক্লুনির সংস্কারে স্থির হয় যে, যাজক, বিশপ বা আর্চবিশপ সবাই ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন। এই ব্যাপারে কোন রাজার বা সামন্তের কর্তৃত্ব থাকিবে না। এই সংস্কারে আরও স্থির হয় যে, রাজকীয় সম্পত্তির মালিকানা এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সর্বদাই ধর্মীয় সংস্থার উপর ন্যস্ত হইবে। রাজার বা সামন্তদের ইহার উপর কোন অধিকার থাকিবে না। এইভাবে ক্লুনির সংস্কার আন্দোলন খৃষ্টান ধর্মাধিষ্ঠান-সমূহকে সামন্ত প্রথার বন্ধন হইতে মুক্ত করে এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ হইতে অব্যাহতি লাভের প্রয়াসী হয়।

ক্লুনির সংস্কারকগণ খৃষ্টান ধর্মযাজকগণের শুদ্ধ জীবনযাত্রার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। আত্মসংযম যাজকগণের একটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বলিয়া গণ্য হয়। সাধু বেনিডিক্ট কর্তৃক প্রবর্তিত যাজকদের পালনীয় নিয়মাবলী পুনঃ প্রবর্তনের চেষ্টা করা হয়। ক্লুনির সংস্কারকগণ মানব সমাজে শান্তির বাণীও প্রচার করিয়াছিলেন।

ক্লুনির সংস্কার আন্দোলনের জনপ্রিয়তা ছিল অপরিসীম। অতি অল্পসময়ের মধ্যে এই আন্দোলনের ঢেউ ফ্রান্স, স্পেন, ইংলণ্ড, জার্মানী ও ইটালীতে ছড়াইয়া পড়ে এবং এই সব দেশের ধর্মাধিষ্ঠানসমূহকে প্রভাবিত করে। খৃষ্টান যাজকদের দুর্নীতি ও নৈতিক অধঃপতন হইতে রক্ষা করিয়া, খৃষ্টান ধর্মাধিষ্ঠানসমূহকে সামন্ত প্রথা ও ধর্মীয় সংস্থা বহির্ভূত নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত করিয়া এবং ধর্মীয় সংস্থায় নূতন প্রাণ সঞ্চার করিয়া 'ক্লুনির সংস্কার আন্দোলন' খৃষ্টান ধর্মের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মধ্যযুগে ইউরোপে খৃষ্টান ধর্মাধিষ্ঠানে কর্তৃত্ব লইয়া পোপ বনাম রাষ্ট্রের দ্বন্দ্ব

ক্লুনির সংস্কার আন্দোলনের ফলে খৃষ্টান ধর্মাধিষ্ঠানসমূহের উপর পোপের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা লইয়া রাষ্ট্রের সহিত পোপের সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠিল। বিশপ ও আর্চবিশপ নিয়োগ ব্যাপারে রাজার কোন কর্তৃত্ব থাকিবে না, ইহা হইতেই বিরোধের সূত্রপাত। মধ্যযুগের ইউরোপের ইতিহাসে ইহা 'ইনভেষ্টিচ্যার সমস্যা' নামে খ্যাত। 'ইনভেষ্টিচ্যার' কথাটির অর্থ কোন পদে অধিষ্ঠিত করা।

ক্লুনির সংস্কারগুলি পোপ কর্তৃক গৃহীত হইলে এই আন্দোলন সারা ইউরোপে বিস্তার লাভ করে। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর তৃতীয় ভাগে হিল্‌ডিব্রাণ্ড সপ্তম গ্রেগরী রূপে পোপ পদে অধিষ্ঠিত হইলে এই আন্দোলন নূতনরূপ ধারণ করে। হিল্‌ডিব্রাণ্ড ছিলেন নিয়মতান্ত্রিক কঠোর প্রকৃতির লোক। তিনি পোপের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর ছিলেন। তিনি বলিতেন, সকল সম্রাটের প্রভু হইতেছেন পোপ, ভগবানের আদেশ পালন করাই হইল ধর্ম এবং ভগবানের আদেশ পালন করার অর্থ হইল পোপের আদেশ পালন করা।

১০৭৫ খৃষ্টাব্দে গ্রেগরী রোমে যাজকদের এক সম্মেলন আহ্বান করিয়া অর্থের বিনিময়ে যাজকত্ব গ্রহণ এবং যাজকদের বিবাহ নিষিদ্ধ করেন। এই সম্মেলনে ইহাও স্থির হয় যে, কোন যাজক ধর্মাধিষ্ঠানের বহির্ভূত কোন লোক কর্তৃক নিযুক্ত হইলে তাহা গ্রাহ্য হইবে না এবং রাজা, ডিউক, কাউন্ট বা অন্য কোন অযাজকীয় ব্যক্তি যদি কাহাকেও খৃষ্টান ধর্মাধিষ্ঠানের কোন পদে অধিষ্ঠিত করিতে উদ্যত হন তাহা হইলে তিনি সমাজচ্যুত হইবেন। গ্রেগরীর এই অনুশাসনকে কেন্দ্র করিয়া প্রায় দুই শতাব্দী কাল ধরিয়া পোপ বনাম রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলিতে থাকে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভব

পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর পশ্চিম ইউরোপে শিক্ষা-ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়ে। ক্রমে খৃষ্টধর্ম প্রসারের সঙ্গে খৃষ্টান ধর্মযাজকরা শিক্ষার প্রসারের কথা অনুভব করেন। ফলে কিছু কিছু খৃষ্টান ধর্মাধিষ্ঠানে অর্থাৎ মঠে ও গির্জায় স্কুল খোলার ব্যবস্থা হয়। প্রয়োজনের তুলনায় তাহা ছিল অবশ্য যৎসামান্য। প্রকৃতপক্ষে মঠের সন্ন্যাসীরাই মধ্যযুগের প্রারম্ভে শিক্ষা-সংস্কৃতির সূচনা করেন। মঠের বা গির্জার স্কুলগুলিতে শেখান হইত ধর্মশাস্ত্র আর কিছু সাহিত্য ও ব্যাকরণ। ইহা ছাড়া, দুর্গের মধ্যে সামন্ত শ্রেণীর অভিজাতদের ছেলেমেয়েদের নির্দিষ্ট প্রকার সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল এবং কলকারখানার মালিকরা নিজ নিজ স্বার্থে শিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্যের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেন। কালক্রমে খৃষ্টীয় একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে শিক্ষার চাহিদা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায় এবং উপজীবিকা সংক্রান্ত বিবিধ বিষয়ে শিক্ষার আগ্রহ দেখা যায়। মঠের বা গির্জার স্কুলগুলি এই ক্রমবর্ধমান শিক্ষার চাহিদা মিটাইতে অক্ষম ছিল। বিপুল সংখ্যক জনগণের শিক্ষায় চাহিদা মিটাইতে উদ্ভব হইল বিশ্ববিদ্যালয়ের। মঠের ও গীর্জার স্কুলগুলি হইতেই ক্রমবিবর্তনে পশ্চিম ইউরোপে বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি।

হয়ত কোন কোন মঠে বা গীর্জায় বা কোন শহরে কোন খ্যাতিমান পণ্ডিতের খবর পাইয়া দেশবিদেশের শিক্ষার্থীরা তাঁহার নিকট শিক্ষালাভের জন্য সমবেত হইল। এইভাবে শিক্ষক ও ছাত্রের সম্মেলনকে কেন্দ্র করিয়া সূচনা হইল বিশ্ববিদ্যালয়ের। প্যারিস বিশ্ব-বিদ্যালয় এইভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। আবার, হয়ত বা কয়েকজন শিক্ষক মিলিত হইয়া শহরের বণিকদের সঙ্ঘের ন্যায় সঙ্ঘ গঠন করিতেন। ছাত্রেরা শিক্ষালাভের জন্য তাঁহাদের নিকট আসিত। ক্রমে সেখানে গড়িয়া উঠিত বিশ্ববিদ্যালয়। আবার অনেক সময়ে ছাত্রেরা যুক্তভাবে তাহাদের অধ্যাপনার জন্য শিক্ষক নিযুক্ত করিত এবং ক্রমে

তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইত। ইটালীর বোলোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূত্রপাত এইভাবেই হয়। বিশ্বের সকল শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের জন্য দ্বার উন্মুক্ত বলিয়া এই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম হয় 'বিশ্ববিদ্যালয়।'

এখন বিশ্ববিদ্যালয় বলিতে আমরা যাহা বুঝি তখনকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সেরূপ ছিল না। তখনকার বিশ্ববিদ্যালয়ে না ছিল বড় বড় দালানকোঠা, না বৃহৎ গ্রন্থাগার, না ছিল ছাত্রাবাস। ইউরোপে তখন ছাপার প্রচলন হয় নাই। বইপত্র তখন পাওয়া যাইত না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র গ্রন্থাগারে কয়েকখানি হাতে লেখা পুঁথি থাকিত। অধ্যাপকরা সেইসব পুঁথি হইতে জোর গলায় পাঠ করিতেন ও ব্যাখ্যা করিতেন। ছাত্ররা তাহা শুনিয়া লিখিয়া লইত। পঠিত বিষয় সম্বন্ধে অধ্যাপক ও ছাত্রে আলোচনা চলিত। পঠন-পাঠন হইত ল্যাটিন ভাষায়। অধ্যাপকদের অধিকাংশই ছিলেন যাজক সম্প্রদায়ের লোক।

গোড়ার দিকে ছাত্রদের নির্দিষ্ট কোন বাসস্থান ছিল না। যে যেখানে পারিত সেইখানে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া লইত। তখন যে কোন দেশেই বিদেশীদের বাস করা কঠিন ছিল। তাই এক এক দেশের ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্ঘ গঠন করিত। এই সঙ্ঘগুলিকে 'নেশন' বলা হইত। বিদেশী অধ্যাপকরাও এই 'নেশনে' যোগ দিতেন। নেশনগুলির মধ্যে ছিল রেষারেষি। এক এক সময়ে ক্লাসের মধ্যেই বিভিন্ন নেশনে মারামারি লাগিয়া যাইত। শুধু তাহাই নহে, মধ্যে মধ্যে শহরবাসীদের সঙ্গেও ইহাদের সংঘর্ষ হইত। শহরবাসীদের এবং ছাত্রদের এই বিবাদ 'টাউন ও গাউনের' বিবাদ নামে পরিচিত ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐ সময়ে ছাত্র ও অধ্যাপক টুপি ও গাউন পরিত। এখনো বিশ্বের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন উৎসবে ছাত্ররা টুপি ও গাউন পরে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপে কয়েকজন খ্যাতনামা পণ্ডিতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক ও শিক্ষার প্রসার

খৃষ্টীয় একাদশ ও দ্বাদশ শতকের পশ্চিম ইউরোপে কয়েকজন পণ্ডিত তাঁহাদের পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানানুশীলনে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ফ্রান্সের পিটার এবেলার্ড, জার্মানীর এলবার্টাস ম্যাগনাস্, ইটালীর টমাস একুইনাস্ এবং ইংলণ্ডের রোজার বেকন ছিলেন অন্যতম।

পিটার এবেলার্ড ছিলেন প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি দেশবিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তিনি ধর্মশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে অধ্যাপনা করিতেন এবং এই সব বিষয়ে অনেকগুলি গ্রন্থও রচনা করেন। এবেলার্ড ছিলেন যুক্তিবাদী। তিনি বলিতেন, যাহা সত্য বলিয়া চলিয়া আসিতেছে তাহাই সত্য নহে, বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়া সত্যকে যাচাই করিয়া লইতে হইবে। তিনি ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে এই সমন্বয় সাধন করিয়াছিলেন। গ্রীক পণ্ডিত সক্রেটিসের ন্যায় শিক্ষার্থীর প্রশ্ন এবং যুক্তির মাধ্যমে সেই প্রশ্নের সমাধান করাই ছিল এবেলার্ডের শিক্ষার পদ্ধতি।

জার্মান মনীষী এলবার্টাস ম্যাগনাস্ ছিলেন বোলোনা ও প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক। প্রাচীন গ্রীক দর্শনে এবং আরবীয় বিজ্ঞানে তিনি বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বিজ্ঞানভিত্তিক। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তিনি জ্ঞান আহরণের উপর জোর দেন। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন এবং এরিষ্টট্লের গ্রন্থ জার্মানীতে অনুবাদ করেন।

ইটালীর টমাস একুইনাস্ ছিলেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষী। তিনি প্রচার করেন ধর্ম কেবল বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, যুক্তির উপরও ইহা প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার মতে যুক্তি ও ধর্ম পরস্পর বিরোধী নহে। সত্যকে জানিতে হইলে যুক্তি ও বিশ্বাস দুইই চাই। এই মূলসূত্রের

উপর ভিত্তি করিয়া একুইনাস্ খৃষ্টীয় ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

মধ্যযুগের মনীষীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও মনোভাবের প্রবর্তন করেন ইংরাজ পণ্ডিত রোজার বেকন। পুঁথিগত বিদ্যার উপর নির্ভর না করিয়া পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জ্ঞানানুশীলনের প্রতি তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি নিজে পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, বলবিজ্ঞান, আলোকবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা করিতেন। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে জগতে এমন একদিন আসিবে যখন যন্ত্রের সাহায্যে মানুষ আকাশে উড়িবে, তীরবেগে গাড়ি হাঁকাইবে ও জাহাজ চালাইবে। বেকনের এসব কথা সে যুগে কাহারও মনঃপুত হয় নাই। সেকালের ধর্মবিশ্বাসী লোকেরা তাঁহাকে শয়তানের চেলা মনে করিয়া চৌদ্দ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিল।

সে যুগে শিক্ষক ও ছাত্রের সম্পর্ক ছিল মধুর। শিক্ষকরা মনে করিতেন, শিক্ষার্থীর প্রকৃত জ্ঞানের উন্মেষ সাধনই তাঁহাদের প্রধান কর্তব্য। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে গতানুগতিক কয়েকটি গ্রন্থের গঠন-পাঠনেই প্রকৃত জ্ঞানের উন্মেষ হয় না, যুক্তি ও বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারাই প্রকৃত জ্ঞানার্জন হয়। টমাস একুইনাস্ বাল্যকালে সহজে কথা বলিতে পারিতেন না। এইজন্য তাঁহার সহপাঠীরা তাঁহাকে 'বোবা বলদ' বলিয়া ব্যঙ্গ করিত। কিন্তু একুইনাসের গুরু এলবার্টাস ম্যাগমাস্ বহু যত্নে শিক্ষা দিয়া এই 'বোবা বলদ'কে জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

একাদশ ও দ্বাদশ শতকে পশ্চিম ইউরোপে কয়েকটি সুপ্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে ফ্রান্সের প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তর ইটালীর বোলোনা বিশ্ববিদ্যালয় এবং দক্ষিণ ইটালীর স্যালের্নো বিশ্ববিদ্যালয় ছিল প্রধান। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নের প্রধান কেন্দ্র ছিল। বোলোনা বিশ্ববিদ্যালয় আইনশাস্ত্র এবং স্যালের্নো বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যাপনার জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। এই সময়ে ইংলণ্ডে অক্সফোর্ড ও কেম্বি্জ

বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ইহার পূর্বে ইংরাজ ছাত্ররা প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিত। কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় তাহারা অক্সফোর্ডে আসিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্তন করে। পরে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। এই সময়ে বোলোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র মিলিত হইয়া পাডুয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে। এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রীক সাহিত্য ও দর্শন, খৃষ্টান ধর্মশাস্ত্র, রোমান আইন, তর্কবিদ্যা, ইতিহাস, ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইত। তাই দূর দূরান্ত হইতে বহু শিক্ষার্থী এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিয়া ভীড় করিতে লাগিল। যাহারা আইনজ্ঞ হইতে চায় তাহারা গেল বোলোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে, যাহারা চিকিৎসাবিদ্ হইতে চায় তাহারা গেল স্যালের্নো বিশ্ববিদ্যালয়ে, যাহারা যাজক বৃত্তি গ্রহণ করিতে চায় তাহারা গেল প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং যাহারা সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিতে চায় তাহারা গেল অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। এইভাবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ বিশেষ বিষয়ের অধ্যাপনায় খ্যাতিলাভের জন্য ছাত্রসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং ইহার ফলে আইনশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষার প্রসার ঘটে।

অনুশীলনী

বাস্তবভিত্তিক ও মৌখিক প্রশ্নাবলী ঃ

১। শার্লম্যান কি নামে খ্যাত ছিলেন ?

২। স্প্যানিস যুদ্ধে শার্লম্যানের সেনাবাহিনীর অধিনায়ক কে ছিলেন ?

৩। শার্লম্যানের দরবারে কে একটি অদ্ভুত ঘড়ি ও একটি হাতি উপহার পাঠাইয়াছিলেন ?

৪। পোপ সপ্তম গ্রেগরীর পূর্ব নাম কি ছিল ?

৫। কোন্ খ্রীষ্টাব্দে গ্রেগরী রোমে যাজকদের এক সম্মেলন আহ্বান করেন ?

৬। পিটার এবেলার্ড কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন ?

৭। স্যালের্নো বিশ্ববিদ্যালয় কোন্ শাস্ত্র অধ্যাপনায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী ঃ

১। শার্লম্যান কে ছিলেন ? তাঁহার চেহারা ও চরিত্র বর্ণনা কর।

২। বিজেতা ও শাসক হিসাবে শার্লম্যানের কৃতিত্ব বর্ণনা কর।

৩। মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপের কয়েকজন খ্যাতনামা পণ্ডিতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৪। মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপের কয়েকটি প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম কর এবং সেই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ পাঠ্য সূচীর উল্লেখ কর।

৫। হিলডিব্রাণ্ড কে ছিলেন ? তাঁহার বক্তব্য কি ছিল ?

৬। পোপ গ্রেগরী কর্তৃক আহূত সম্মেলনে কি সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল ?

৭। খ্রীষ্টান ধর্মাধিষ্ঠানের কর্তৃত্ব লইয়া পোপ বনাম রাষ্ট্রের দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৮। 'টাউন ও গাউনে'র বিবাদ সম্বন্ধে কি জান ?

৯। মধ্যযুগে ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও ছাত্রের সম্পর্ক কিরূপ ছিল ?

১০। 'রোলাণ্ডের গীতি'র বিষয়বস্তু কি ?

রচনাত্মক প্রশ্নাবলী ঃ

১। শার্লম্যানের অভিষেক কাহিনী বর্ণনা করিয়া এই অভিষেকের গুরুত্ব আলোচনা কর।

২। জ্ঞান-বিদ্যা, সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে শার্লম্যানের পরিচয় দাও।

৩। মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপের খ্রীষ্টান মঠগুলি এবং মঠের নিয়মবিধি বর্ণনা কর।

৪। ক্লুনি মঠ কোথায় অবস্থিত ছিল ? ক্লুনির সংস্কার আন্দোলনের মূল কথাগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৫। মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভবের কাহিনী বর্ণনা কর।

অধ্যায় ৭

মধ্যযুগে ইউরোপে ফিউডালিজম্ বা সামন্তপ্রথা

প্রথম পরিচ্ছেদ

'ফিউডালিজম্' বা 'সামন্তপ্রথা'র উদ্ভব ও ইহার কারণ

পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর ইউরোপে রাষ্ট্রীয় সংগঠন শিথিল হইয়া আসিলে সারা ইউরোপ জুড়িয়া দেখা দিল অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা। সুযোগ পাইলেই প্রবলেরা দুর্বলদের উপর নানা অত্যাচার করিতে লাগিল। 'জোর যার মুল্লুক তার', ইহাই ছিল তখনকার নীতি। ইহার উপর ছিল বহিশত্রুর উৎপাত। উত্তর দিক হইতে নর্মানরা, পূর্বদিক হইতে হাঙ্গেরীয়ানরা এবং দক্ষিণ দিক হইতে আরবেরা ইউরোপে যখন তখন হানা দিত, লুণ্ঠন করিত এবং নিরীহ জনসাধারণের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিত। এই অবস্থায় অসহায় দুর্বল জনগণ নিরাপত্তার অভাব বোধ করিয়া প্রবলের আশ্রয়ে বাঁচিবার পথ খুঁজিয়া পাইল। এই প্রয়োজনবোধ হইতে গড়িয়া উঠিল ফিউডালিজম্ বা সামন্তপ্রথা।

ফিউডালিজম্ বা সমান্তপ্রথার উদ্ভব একদিনে হয় নাই। বহু দিনের অত্যাচার ও অরাজকতার চাপে এই ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে। মোটামুটি ভাবে বলা যায় ৮০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যুগটি ছিল ফিউডাল যুগ বা সামন্তপ্রথার যুগ। এই ব্যবস্থার আসল কথা সমাজের প্রবলের ও দুর্বলের মধ্যে একটা চুক্তি। এই চুক্তির মূল কথা হইল একজন সাধারণ লোক নিরাপত্তার জন্য তাহার অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী জমিদারের আশ্রয় পাইবে এবং এই আশ্রয়ের বিনিময়ে সে জমিদারের সেবা করিবে। জমিদারের নানাপ্রকার কাজকর্মের জন্য লোকের প্রয়োজন ছিল। তাহা ছাড়া, শত্রুকে মোকাবিলা করিবার জন্য জমিদারের একদল অনুচরেরও প্রয়োজন ছিল। সুতরাং এই ব্যবস্থায় পরস্পরের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য উভয়ের মধ্যে একটা

বোঝাপড়া হইল। বিপদে আপদে জমিদাররা আশ্রিতদের রক্ষা করিবেন এবং আশ্রিতরা আনুগত্যের শপথ লইয়া তাঁহাদের সেবা করিবে। মোট কথা, ফিউডালিজম্ বা সামন্তপ্রথায় ধনী দরিদ্রে, প্রবল-দুর্বলে এক নূতন সম্পর্ক স্থাপিত হইল।

এইখানে উল্লেখযোগ্য যে, হীনবল নরপতিগণের দুর্বলতার সুযোগে এবং দক্ষ শাসন ব্যবস্থার অভাবে সমাজে সামন্তশ্রেণীর উদ্ভব হয় এবং ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে ফিউডালিজম্ বা সামন্তপ্রথা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ফিউডালিজম্ বা সামন্তপ্রথায় ভূমির ভূমিকা এবং মানুষে মানুষে বন্ধনের যোগসূত্র

দেশের ভূমি ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিয়াই মধ্যযুগের ইউরোপে ফিউডালিজম্ বা সামন্তপ্রথা গড়িয়া উঠে। আইনতঃ কোন দেশের রাজা ছিলেন সমস্ত জমির মালিক। দেশের সমস্ত জমি নিজ আয়ত্তে রাখা দুরূহ ব্যাপার মনে করিয়া রাজা তাঁহার বড় বড় অনুচরদের মধ্যে জমি বণ্টন করিয়া দিতেন। এইভাবে যাহারা জমি পাইলেন তাঁহাদের সামন্ত বলা হইত। জমির বিনিময়ে সামন্তরা রাজার নিকট আনুগত্য ও সেবার শপথ গ্রহণ করিত এবং যুদ্ধের সময়ে রাজাকে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিত। এই দত্ত জমিকে বলা হইত 'ফিফ্' (Fief) বা ফিউড' (Feud)। দত্ত জমিকে কেন্দ্র করিয়া যে ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিল তাহাকে বলা হইত ফিউডালিজম্ (Feudalism) বা সামন্ততন্ত্র।

বড় বড় সামন্তরা আবার নিজ নিজ জমি অনুরূপ শর্তে নিজ নিজ অনুচরদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতেন। এই সব অনুচরদের বলা হইত উপ-সামন্ত। এইভাবে পর্যায়ক্রমে জমি বণ্টন ব্যবস্থা সাধারণ গৃহস্থের স্তর পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। দেশের সবার উপরে রাজা, রাজার নীচে সামন্ত, সামন্তের নীচে উপ-সামন্ত এবং সকলের নীচে চাষীও

ভূমিদাস—এইভাবে ফিউডালিজম্ বা সামন্তপ্রথায় সমাজে স্তর বিভাগ হইল। ফিউডালিজম্ বা সামন্ততন্ত্র প্রবর্তনের ফলে ইউরোপে এক পিরামিড আকারের সমাজব্যবস্থা গড়িয়া উঠিল। এই পিরামিডের চূড়ায় রাজা এবং তলদেশে সার্ফ বা ভূমিদাসের স্থান। ফিউডালিজম্ বা সামন্ততন্ত্র ছিল মূলতঃ মধ্যযুগীয় ইউরোপের শাসনব্যবস্থার একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। এই ব্যবস্থায় সামন্তরা নিজ নিজ এলাকায় শাসনকার্য চালাইতেন, এমন কি বহুক্ষেত্রে সার্বভৌম অধিকারসমূহ ভোগ করিতেন। নিজ নিজ এলাকায় শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব থাকিত তাঁহাদেরই উপর। নিরীহ প্রজাদের তাঁহারাই ছিলেন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। এই ব্যবস্থায় জমির মালিকানার সহিত শাসন কর্তৃত্ব একই সঙ্গে ন্যস্ত হইত। দুর্বল নরপতিগণ একান্ত নিরুপায় হইয়াই সামন্তদের এই সকল অধিকার স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন।

এইভাবে ইউরোপে রাজা ও সাধারণ প্রজার মাঝখানে উদ্ভব হইল সামন্ত নামে এক শ্রেণীর অভিজাত সম্প্রদায়। সামন্তরা ছিলেন জমির মালিক এবং সমাজে বিশেষ প্রভাবশালী। জীবিকার জন্য তাঁহাদের পরিশ্রম করিতে হইত না। বেশীর ভাগ জমি তাঁহারা আবার নিজ নিজ অনুচরদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতেন বা চাষী ও ভূমিদাসদিগকে ইজারা দিতেন, আর কিছু জমি নিজের জন্য রাখিয়া চাষী বা ভূমিদাসদের দিয়া চাষ করাইতেন। সামন্তরা একদিকে রাজার সেবা করিতে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন, আবার অপরদিকে চুক্তি বদ্ধ ছিলেন নিজ নিজ এলাকায় অসহায় প্রজাদের রক্ষা করিতে। সামন্তরা রাজদরবারে উপস্থিত থাকিয়া রাজাকে শাসন ও বিচারকার্যে সহায়তা করিতেন, রাজকীয় কোন উৎসব বা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইতেন ও অর্থ-সাহায্য করিতেন, যুদ্ধের সময়ে রাজাকে সৈন্য সরবরাহ করিতেন এবং রাজার হইয়া যুদ্ধে লড়াই করিতেন। ইহার পরিবর্তে সামন্তরা ভোগ করিতেন জমির অধিকার আর প্রজাদের উপর অধিকার।

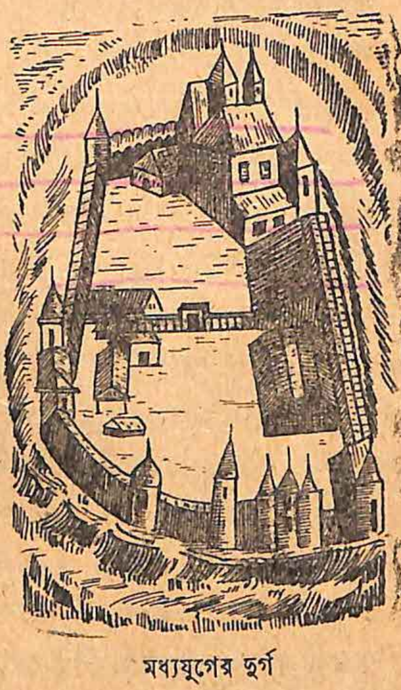
মোট কথা ফিউডালিজম্ বা সামন্ত প্রথার মূলভিত্তি হইল ব্যক্তির প্রতি আনুগত্য, রাষ্ট্রের প্রতি নহে। ফিউডালিজম্ বা সামন্তপ্রথার

প্রধান ত্রুটি হইল এই যে, রাজার সহিত সাধারণ প্রজার প্রত্যক্ষ কোন সম্বন্ধ ছিল না। রাজা ও সামন্তদের যুদ্ধে সামন্তদের অধীন প্রজারা সামন্তদের হইয়াই লড়াই করিত এবং ইহার ফলে বহু সামন্ত দেশের রাজার অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ফিউডাল বা সামন্ত দুর্গ ও বর্মাচ্ছাদিত ঘোড়সওয়ারদের ভূমিকা

বিত্তশালী সামন্তরা শত্রুদের আক্রমন হইতে আত্মরক্ষার জন্য বাস করিত দুর্গের আকারে নির্মিত প্রাসাদে। দেশের প্রতিরক্ষার প্রয়োজনেই এই সব দুর্গ গড়িয়া উঠিয়াছিল। পাহাড়ের চূড়ায় বা বৃহৎ মাটির ঢিবির উপর এই সব দুর্গ তৈয়ারি হইত। উন্মুক্ত পল্লী অঞ্চলে সুউচ্চ দুর্গ সমূহ সামন্তদের স্বাধীনতার প্রতীক ছিল। দুর্গের চারিধারে থাকিত উচ্চ ও প্রশস্ত প্রাচীর, আর প্রাচীর ঘিরিয়া থাকিত জলপূর্ণ পরিখা। প্রাচীরের গায়ে তীর নিক্ষেপের জন্য সরু লম্বা ফোকর থাকিত। দুর্গের প্রবেশ পথে পরিখার উপর থাকিত সেতু। প্রয়োজনে সেতু পাতা ও তোলা যাইত। এই রকম সেতুকে 'ড্র বিজ' বলা হইত। দুর্গের



মধ্যযুগের দুর্গ

ফটক ছিল প্রকাণ্ড। ফটকে লোহার প্লেট ও বড় বড় পেরেক লাগানো ছিল। ফটকের পাশে লোহার মই দেওয়াল বাহিয়া নামিয়া আসিত। প্রয়োজনে উহা গুটাইয়া ফেলা যাইত। দুর্গের ভিতরকার দেওয়ালে বর্শা, ঢাল, অস্ত্রশস্ত্র ও শিকারের দ্রব্যাদি টাঙানো থাকিত।

প্রথম দিকে দুর্গগুলি কাঠে তৈয়ারী ছিল। পরবর্তি কালে দুর্গগুলি পাথরে তৈয়ারী হইতে থাকে। এই সব দুর্গের মধ্যে অতিথিদের বাসস্থান, উপাসনাগৃহ, খামারবাড়ি, ভোজের জন্য প্রকাণ্ড হলঘর আস্তাবল সবই ছিল। দুর্গরক্ষায় সশস্ত্র প্রহরী নিযুক্ত হইত। দুর্গ আক্রান্ত হইলে সামন্তদের পত্নীরা দুর্গরক্ষায় বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিতেন।

বর্তমান যুগের ন্যায় মধ্যযুগেও ইউরোপে দেশ রক্ষার উদ্দেশ্যে সামরিক ব্যায়ের পরিমান কম ছিল না। প্রকাণ্ড দুর্গনির্মাণে এবং সামরিক অস্ত্রশস্ত্রের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যায় হইত। বর্ম পরিহিত ঘোড়সওয়াররা 'নাইট' (Knight) নামে অভিহিত ছিল। তাহাদের প্রধান কর্তব্য ছিল যুদ্ধ। তাহারা সমস্ত শরীর বর্মে আবৃত রাখিয়া মাথায় শিরস্ত্রান পরিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া তরবারি ও বর্শা লইয়া যুদ্ধ করিত। এই ভাবে মধ্যযুগে ইউরোপ ব্যাপিয়া সামন্তদের সুরক্ষিত দুর্গসকল বহিঃশত্রুর হাত হইতে ইউরোপকে রক্ষা করিতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
ফিউডালিজম্ বা সামন্ততন্ত্রে জীবনযাত্রা

ম্যানরে বা দুর্গে সামন্তরা বেশ সমারোহের সহিত বাস করিতেন। পোষাক-পরিচ্ছদে, খাদ্যদ্রব্যে, আমোদ-প্রমোদে তাঁহারা আড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন। সামন্তরা শীত ও গ্রীষ্মে পশমী পোষাক ব্যবহার করিতেন। পরে অবশ্য রেশমী ও তুলাজাত বস্ত্রের প্রচলন হয়। দুর্গগুলির অভ্যন্তর ভাগ অত্যন্ত ঠাণ্ডা থাকায় প্রচুর শীতবস্ত্রের প্রয়োজন হইত। সামন্তদের খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য ছিল। শাকসব্জীর মধ্যে ছিল বাঁধাকপি, ওলকপি, গাজর, বীট, মটরশুঁটি ও পেঁয়াজ। ফলের মধ্যে প্রধান ছিল আপেল ও ন্যাসপাতি। মাছ ও মাংস খাদ্যের প্রধান উপকরণ ছিল। তখন চা ও কফির ব্যবহার অজ্ঞাত ছিল, মদ্যপানের ব্যাপক প্রচলন ছিল। মধ্যে মধ্যে দুর্গে ভোজের আয়োজন হইত। ভোজে একটা

গোটা ষাঁড় বা শূকর আগুনে ঝলসাইয়া ছুরি দিয়া কাটিয়া খাওয়া হইত। মদ্যপানের ঢালাও ব্যবস্থা থাকিত। পরে খাদ্যে প্রাচ্যদেশজাত মশলার ব্যবহার করা হয়।

সামন্তদের প্রধান আনন্দ ছিল শিকার। কুকুর ও হাতের কব্জিতে শিকল বাঁধা বাজপাখি লইয়া তাঁহারা শিকারে যাইতেন। শিকারের শেষে বিরাট ভোজের অয়োজন হইত। সামন্তরা তাঁহাদের অনুচরদের লইয়া অধিক রাত্রি পর্যন্ত পানভোজন করিতেন। সামন্তদের ভাড় থাকিত। নানা হাস্য পরিহাসে তাহারা প্রভুর আনন্দবর্ধন করিত। মধ্যে মধ্যে মল্লবীরদের কুস্তি, বাজিকরের খেলা ও ভ্রাম্যমাণ চারণকবিদের গান সামন্তদের বেশ আনন্দ দিত। অনেক সময়ে কোন বণিক তাহার পণ্যদ্রব্যাদি লইয়া আসিয়া বা কোন তীর্থযাত্রী দূর দূর দেশের গল্পমালা বলিয়া সামন্তদের চিত্ত বিনোদন করিত।

মধ্যযুগের দুর্গসমূহে স্ত্রীলোকদের তেমন অবসর ছিল না। অতিথি অভ্যাগতদের তদারকির ভার ছিল দুর্গের স্ত্রীলোকদের উপর।

অপরদিকে সাধারণ চাষী গৃহস্থরা কোনরকমে দিন গুজরান করিত। তাহাদের চাহিদা ছিল অল্প। ভবিষ্যতের কোন সংস্থান তাহাদের ছিল না। ছোট ছোট জানালা লাগানো কাঠের কুঠরিতে তাহারা বাস করিত। এক একটি কুঠরিতে অনেক লোককে গাদাগাদি করিয়া থাকিতে হইত। সম্পত্তি বলিতে তাহাদের ছিল একটি গরু, কয়েকটি শূকর ও বলদ। একটু অবস্থাপন্ন চাষীর একটা ঘোড়া থাকিত। শাকসব্জি ও মোটা রুটি ছিল তাহাদের প্রধান খাদ্য। মাংস প্রায় তাহাদের জুটিতই না। তাহাদের পানীয়ের মধ্যে ছিল টক মদ।

চাষীদের প্রয়োজনীয় পোষাক পরিচ্ছেদ ছিল না। মোটা পশম বা শনে বোনা বা পশুর চামড়ায় তৈয়ারী পোষাক তাহারা ব্যবহার করিত। চাষী পরীবারের স্ত্রীলোকদের যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইত। সব্জি ফলানো, সুতা কাটা, পশমের জামাকাপড় বানানো প্রভৃতি ছিল তাহাদের প্রধান কাজ। ইহা ছাড়া ছিল গৃহস্থালীর কাজ ও চাষের কাজে সাহায্য করা। বস্তুতঃ চাষীদের অভাব অনটনের মধ্যে দিন

কাটাইতে হইত। জীবন যাত্রা তাহাদের মোটেই সচ্ছল ছিল না। ইহার উপর মনিব খারাপ লোক হইলে চাষীদের কষ্টের সীমা থাকিত না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মধ্যযুগে ইউরোপে নাইটদের শিভালরি ও ট্রুবারগণ

মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপে সামন্তগণ নিজ নিজ অঞ্চলে এক একজন স্বাধীন রাজার ন্যায় প্রভুত্ব করিতেন। তাঁহারাই ছিলেন সমাজে সম্ভ্রান্ত অভিজাতশ্রেণী। তাঁহারা বড় সৈন্যদল রাখিতেন। কেননা নিজেদের প্রয়োজন ছাড়াও রাজার প্রয়োজনের সময়ে তাঁহাদের সৈন্য দিয়া সাহায্য করিতে হইত। সেইজন্য সামন্তরা অল্প বয়স হইতেই তাঁহাদের ছেলেদের সামরিক শিক্ষার উপর জোর দিতেন। তরুণ বয়সে অভিজাত শ্রেণীর ছেলেরা একজন বড় বীর বা খ্যাতনামা যোদ্ধার নিকট থাকিয়া ঘোড়ায় চড়া, বর্শা ও তরবারি চালনা, শিকার করা ইত্যাদি শিখিত। তখন তাহাদের বলা হইত 'স্কোয়ার' (Squire)। এই শিক্ষায় লেখাপড়ার কোন ব্যবস্থা ছিল না।

একুশ বৎসর বয়সে যুদ্ধবিদ্যা ভালরূপে আয়ত্ত করিয়া স্কোয়ারগণ নিজেদের জমিদারীতে ফিরিয়া আসিত। ইহার পর তাহারা রাজা বা বড় সামন্তকে 'প্রভু' বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকট হইতে 'নাইট' (Knight) পদমর্যাদা লাভ করিত। এই পদ মর্যাদা গ্রহণের সময়ে তাহারা নিজ নিজ প্রভুর সম্মুখে নতজানু হইয়া প্রতিজ্ঞা করিত যে, তাহারা কাপুরুষতা ত্যাগ করিবে, কথায় ও কাজে ভদ্রতা শিষ্টাচার রক্ষা করিবে, বিপন্নকে উদ্ধার করিবে. আর্তকে সাহায্য করিবে, নারী-জাতির সম্মান রক্ষা করিবে এবং প্রভুর প্রতি অনুরক্ত থাকিবে। শপথ গ্রহণের পর প্রভু একখানি তরবারি দিয়া নিজ নিজ নাইটের গাত্র স্পর্শ করিয়া আশীর্বাদ করিতেন. ঈশ্বরের নামে আমি তোমাকে নাইট

করিলাম। তুমি বীর, নির্ভয় ও প্রভুর অনুগত হও।' ইহার পর নাইটের কোমরে একটি তরবারি বাঁধিয়া দেওয়া হইত। এই নাইট-পদমর্যাদা বংশানুক্রমিক চলিত না, অভিজাত শ্রেনীর প্রত্যেক যুবককে নিজের যোগ্যতা দেখাইয়া ইহা অর্জন করিতে হইত।



নাইট

নাইটদের কতকগুলি রীতিনীতি ও আচারব্যবহার মানিয়া এক পবিত্র জীবন যাপনের শপথ লইতে হইত। প্রভুর প্রতি বিশ্বস্ততা, ধর্মের রক্ষণ সর্বদা সত্যভাষণ, দুর্বল ও বিপন্নকে সাহায্য দান, নারী-জাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন, শিষ্টাচার, অদম্য সাহস ও বীরত্ব, স্বদেশের জন্য বা বিপন্নকে উদ্ধারের জন্য আত্মোৎসর্গ ইত্যাদি ছিল নাইটের আদর্শ। এই আদর্শকে বলা হইত 'শিভালরি' (Chivalry) বা 'বীরধর্ম'। নাইটের আদর্শে মধ্যযুগীয় ইউরোপের জীবনযাত্রা অনেকখানি সভ্য হইয়া উঠে। তাই মধ্যযুগীয় 'শিভালরি'কে ফিউডালিজম বা সামন্তপ্রথার 'প্রস্ফুটিত পুষ্প' বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

নাইট-জীবনের প্রধান কর্তব্য ছিল যুদ্ধ। ঘোড়ায় চড়িয়া তরবারি ও বর্শা লইয়া তাহারা প্রায়ই যুদ্ধ করিত। দেহরক্ষার জন্য তাহাদের সমস্ত শরীর বর্মে আবৃত থাকিত। তাহাদের হাতে থাকিত ঢাল ও লম্বা বর্শা আর মাথায় থাকিত মুখঢাকা লোহার শিরস্ত্রাণ। শিকার করা ও কৃত্তিম যুদ্ধ প্রতিযোগিতা বা 'টুর্নামেন্ট' ছিল তাহাদের জীবযাত্রার প্রধান অঙ্গ। টুর্নামেণ্টে যাহারা জয়ী হইত তাহাদের খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িত। নাইটদের আর্তকে সাহায্য করা

এবং দুর্গে আবদ্ধ বিপন্ন নারীকে উদ্ধার করার বহু কাহিনী নানা দেশের গাথা ও সাহিত্যে চিত্রিত হইয়াছে।

ট্রুবাডুর : খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত দক্ষিণ ফ্রান্স, উত্তর স্পেন এবং ইটালীতে ট্রুবাডুর নামে এক শ্রেনীর চারণ কবি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। জার্মানীতে এই সব চারণ কবিদের মিনিসিঙ্গার বলা হইত। বাঁশির সুরে সুরে দেশীয় ভাষায় নূতন কবিতা রচনা করা ও সঙ্গীত পরিবেশন করাই ছিল ট্রুবাডুগণের প্রধান উপজীবিকা। ইংলণ্ডের রাজা রিচার্ড দ্য লায়ন, ডিউক গিল্‌হেম, কাউন্ট তৃতীয় রবট প্রমুখ সম্ভ্রান্ত অভিজাত শ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া ভবঘুরে সাধারণ পথিক এই ট্রুবাডুর সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।

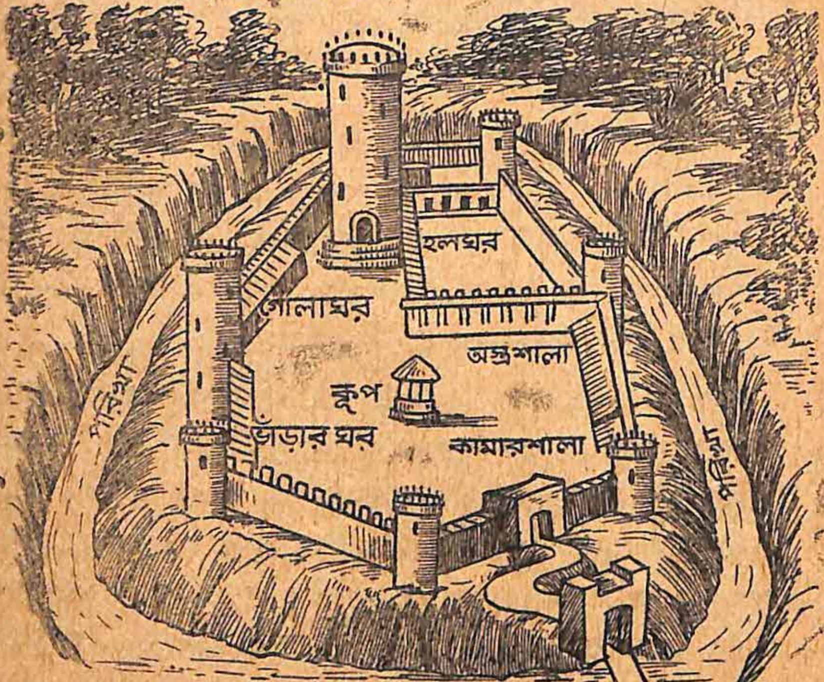
ট্রুবাডুরদের বিকাশকালে প্রায় চারিশত ট্রুবাডুর স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিলেন। এই ট্রুবাডুরদের মধ্যে কয়েকজন মহিলাও ছিলেন। তন্মধ্যে ডিউক গেল্‌হেমের কন্যা গুইয়েন এবং মহিলা ডিউক বিট্রিক্স বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। কবি দান্তে আর্ণট ড্যানিয়েল নামে এক ট্রুবাডুরের সঙ্গীত রচনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

মধ্যযুগের ইউরোপীয় সাহিত্যে ট্রুবাডুরদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। প্রচলিত বীরত্ব ও প্রেমের গল্প ও কাহিনী অবলম্বনে তাঁহারা পদ রচনা করিতেন। ট্রুবাডুরদের বাক্ স্বাধীনতা ছিল। এবং তাঁহারা অবাধে রাজনৈতিক বিষয় সমূহের উপরও কবিতা রচনা করিতেন। এইসব কবিতা ও সঙ্গীতের মাধ্যমে অভিজাত শ্রেণীর দরবারে সম্ভ্রান্ত মহিলাদের ঘিরিয়া তাঁহারা সুরুচিসম্পন্ন এক পরিবেশ সৃষ্টি করিতেন। 'জগ্‌লার' নামক একজন শিক্ষানবীশ বা সহচর ট্রুবাডুরদের সঙ্গীতের সহিত বাদ্যযন্ত্র সহযোগে সুর উৎপাদন করিত। দুঃখের সঙ্গীতও তাঁহারা গাহিতেন। কথিত আছে, শেষ ফরাসী ট্রুবাডুর গুইরট রিকুইর (১২৩০খৃঃ—১২৯৪খৃঃ) দুঃখের সঙ্গীত গাহিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ট্রুবাডুরদের বহু কবিতা ও সঙ্গীত এখনও অক্ষুণ্ণ আছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ম্যানর প্রথা : ম্যানরের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ও ম্যানর আদালত

মধ্যযুগে ইউরোপে ম্যানরপ্রথা ছিল ফিউডালিজম্ বা সামন্ত-প্রথারই অঙ্গ। ইহা আংশিক রোমান এবং আংশিক জার্মান প্রথা হইতে উদ্ভূত। রোমান ভিলা বা জার্মান মুক্তগ্রাম হইতে ম্যানর প্রথার সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া মনে করা হয়। এই রকম জায়গীরকে ইংলণ্ডে বলা হইত 'ম্যানর', ফ্রান্সে ও ইউরোপের সর্বত্র বলা হইত 'সিনরি' এবং রাসিয়ায় 'ভত্‌চিনা'।



ম্যানরের নক্সা (অংশিক)

'ম্যানর' কথাটির অর্থ হইল গ্রাম, মৌজা বা তালুক। এই ম্যানর ছিল ফিউডাল লর্ড বা সামন্তদের অধীন। প্রত্যেকটি ম্যানর ছিল ফিউডালিজম্ বা সামন্ততন্ত্রের শাসনব্যবস্থার স্থানীয় একক। এক একটি বড় ম্যানরে অনেক সময়ে একাধিক গ্রামও থাকিত।

প্রত্যেক ম্যানরে বেশীর ভাগ থাকিত চাষী-সম্প্রদায়। ইহা ছাড়া কামার, কুমোর, তাঁতি, জেলে, পুরোহিত প্রভৃতিরাও ম্যানরে বাস করিত। আর ম্যানরে থাকিত সামন্তদের প্রকাণ্ড বাসভবন 'ম্যানর হাউস' বা দুর্গ। এক একটি ম্যানরে চাষীদের শ্রম দ্বারা উৎপন্ন শস্যই ছিল সামন্তদের আয়ের উৎস। ইহা ছাড়া কৃষকদের উপর ধার্য খাজনাও সামন্তরা আদায় করিত। অতএব যে প্রথার মাধ্যমে প্রত্যেক ম্যানরের সামাজিক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং বিচারব্যবস্থা পরিচালিত হইত তাহাকে 'ম্যানরপ্রথা' বলা হইত।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈনিক দিক হইতে ম্যানর প্রথা সামন্ততন্ত্রের অংশ বিশেষ ছিল। সামন্ত-প্রথা ছিল স্বাধীন উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সামন্তদের জীবনযাত্রা প্রণালী, আর ম্যানরপ্রথা হইল প্রায় ক্রীতদাস পর্যায়ের ভূমিচাষীদের জীবনযাত্রা-প্রণালী। দুইটি সম্প্রদায় একই ম্যানরে বাস করিলেও রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কারণে তাহাদের মধ্যে যোগাযোগ ছিল বটে কিন্তু সামাজিক দিক হইতে অভিজাতবর্গের নিকট কৃষককুল ছিল অস্পৃশ্য। মধ্যযুগে প্রচলিত ধারণা ছিল যে, ভগবানই সমাজের বিভিন্ন লোককে তিনটি শ্রেণী যথা—যাজকশ্রেণী, অভিজাতশ্রেণী ও হীনশ্রেনীতে বিভক্ত করিয়াছেন। হীনশ্রেণীর কর্তব্য ছিল শ্রম দ্বারা অপর দুই শ্রেণীর সেবা করা। হীনশ্রেণীর সুখসুবিধা বা উন্নতি বিধানের জন্য অপর দুই শ্রেণীর কোন ভাবনা বা কর্তব্য ছিল না।

ম্যানরের আদালত ছিল ম্যানর-প্রথার এক বিশিষ্ট অংশ। গ্রাম্য সম্প্রদায়ের প্রত্যেক সদস্যকে এই আদালতে উপস্থিত থাকিতে হইত। গ্রামের গির্জায় ম্যানরের সামন্ত প্রভুর প্রশস্ত দরবার-কক্ষে বা বৃক্ষচ্ছায়ায় এই আদালত বসিত। এই আদালত সামন্তদের সম্পত্তির অধিকারসমূহ এবং গ্রামবাসীদের চিরাচরিত অধিকারসমূহ লইয়া সংঘর্ষ বাধিলে তাহার বিচার করিত। স্থানীয় প্রথা অনুসারে বিচার করিবার জন্য গ্রামবাসীদের আহ্বান করা হইত। সামন্ত প্রভু ও গ্রামবাসীদের যুগ্মনামে বিচারের নিষ্পত্তি হইত। এই সব বিচারে

দরিদ্র অসহায় কৃষককুল যে কোন সুবিচার পাইত তাহা মনে করার কোন কারণ নাই। পরবর্তিকালে আইনজ্ঞগণ ম্যানরের প্রথাসমূহ সামন্তদের সার্থেই লিপিবদ্ধ করেন। ম্যানরের আদালতসমূহে যে সব জরিমানা আদায় করা হইত তাহা সামন্ত প্রভুর প্রাপ্য ছিল এবং সামন্ত প্রভুর আয়ের এক বিরাট অংশ এই সংগৃহীত জরিমানা হইতে আসিত।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ম্যানরে কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা

মধ্যযুগের ইউরোপীয় সাহিত্যে কৃষকদের অত্যন্ত হেয়ভাবে গবাদি পশুর সমতুল্য মনেকরিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে। একজন লেখক উল্লেখ করিয়াছেন যে, কৃষকগণ নোংরা ও দুর্গন্ধ যুক্ত ছিল। তাহারা ছয়মাসকাল স্নান করিত না। তাহারা ছিল অত্যন্ত দুর্নীতি পরায়ন, ঈর্ষাপরায়ণ ও অন্যান্য নানা দোষে দুষ্ট। তাহারা মনে করিত ধনী ব্যক্তিদের নিকট হইতে যে কোন প্রকারে যে কোনও জিনিস লাভ করা পাপ নহে।

ম্যানরে কৃষকদের দুর্দশার সীমা ছিল না। নিজেদের সম্পত্তি বলিতে তাহাদের ছিল খড়ের ছাউনি দেওয়া কাঠের তৈরী কুঁড়ে ঘর' গোয়ালে কয়েকটি গরু, ভেড়া শুকর। তাহারা সামন্ত প্রভুদের অত্যাচারে ও নানা করভারে জর্জরিত ছিল। তাহাদের আয় ছিল যৎসামান্য। যেটুকু আয় তাহারা করিত সামন্ত প্রভুদের কর দিতেই তাহা ব্যায় হইয়া যাইত। ইহার উপর সানন্ত প্রভুদের বিভিন্ন কাজে তাহাদের বাধ্যতামূলকভাবে বেগার খাটিতে হইত। কঠোর শ্রম করিয়া তাহারা যাহা পাইত গ্রাসাচ্ছাদনের পক্ষে তাহা নিতান্তই সামান্য ছিল। তাহারা একবেলাই পেট ভরিয়া খাইতে পারিত না।

ম্যানরে সামন্ত প্রভুদের কয়েকটি জিনিস ব্যবহার করিবার জন্য কৃষকদের বাধ্যতামূলকভাবে কর দিতে হইত। কেননা ইচ্ছা বা অনিচ্ছাসত্ত্বেও কৃষকরা ঐ সব জিনিস ব্যবহার করিতে বাধ্য ছিল, যেমন শস্য পেষণ করিবার, রুটি সেঁকিবার, মদ প্রস্তুত করিবার যন্ত্রসমূহের উপর সামন্ত প্রভুদের একচেটিয়া অধিকার ছিল। তাহা ছাড়া,

গ্রামের কূপ, গ্রামের রাস্তা, গ্রামের পুল, গ্রামের দোকানপাট ও বাজার সবই ছিল সামন্ত প্রভুদের এক্তিয়ারে। সুতরাং জীবনধারণের ঐ সব অত্যাবশ্যক দ্রব্য কৃষকরা ব্যবহার না করিয়া পারিত না এবং ঐসব দ্রব্য ব্যবহার করিবার জন্য তাহাদের কর দিতে হইত। বৎসরের নির্দিষ্ট সময়ে সামন্ত প্রভুরা মদ বিক্রয় করিবার একচেটিয়া অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। এই মদের সামান্য অংশ কৃষকরা ক্রয় করিতে বাধ্য ছিল।

ম্যানরে প্রত্যেক কৃষকের নির্দিষ্ট জমি থাকিলেও ম্যানরের সমস্ত জমি চাষ হইত একসঙ্গে। ম্যানরে জমি এখনকার মত স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত ছিল না। ইহার মধ্যে সামন্ত প্রভুদের নিজস্ব খাসজমিও ছিল। কৃষকদিগকে এই জমি বাধ্যতামূলকভাবে চাষ করিতে হইত। ইহা ছাড়া, সামন্ত প্রভুর গাড়ি চালাইবার আস্তাবলে বিচালি আনিবার শস্যভাণ্ডারে শস্য আনিবার এবং জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করিবার দায়িত্ব ছিল কৃষকের। সামন্ত প্রভুর 'ম্যানর হাউসে' কৃষকের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের বাধ্যতামূলকভাবে কাজ করিতে হইত। 'করভি' নামে এক প্রকার শ্রমও কৃষকদের পক্ষে বাধ্যতামূলক ছিল। রাস্তা নির্মাণ পুল মেরামত, পরিখা খনন এবং জলাশয় পরিষ্কার করাছিল এই 'করভি' শ্রমের অন্তর্ভুক্ত। কৃষকদের অক্লান্ত পরিশ্রমে যে রাস্তা বা পুল নির্মিত হইল এবং কূপ ও জলাশয় খনন করা হইল সেইগুলি ব্যবহারের জন্য কিন্তু তাহাদেরই আবার কর দিতে হইত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ম্যানরে যাজক, অভিজাত ও কৃষকদের জীবনযাত্রা

মধ্যযুগে ইউরোপীয় সমাজে লোকদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছিল যেমন যাজক শ্রেণী, অভিজাত শ্রেণী এবং কৃষকশ্রেণী। সামন্তদের ম্যানরে এই তিন শ্রেণীতে লোক বাস করিত।

প্রত্যেক ম্যানরেই একজন করিয়া পুরোহিত বা যাজক বাস করিতেন। ম্যানরবাসিগণ পুরোহিতের মুখে নানা ধর্মকথা শুনিত। পুরোহিতদের নিকট তাহারা শুনিয়াছিল যে ঈশ্বর স্বর্গে বাস করেন

এবং তিনিই সকল মানুষের পরম পিতা ও উপাস্য দেবতা। পুরোহিত ম্যানরবাসীদের প্রতি রবিবার গীর্জায় যাইতে এবং সর্বদা সত্যকথা বলিতে উপদেশ দিতেন। পুরোহিত তাহাদের আরও বুঝাইতেন যে পোপই ঈশ্বরের প্রতিনিধি এবং স্বর্গও নরকের দরজার চাবি তাঁহারই হাতে। পোপের কথা অমান্য করা মহাপাপ। ইহা ছাড়া, ম্যানরবাসীর নানা সামাজিক অনুষ্ঠানে পুরোহিতের প্রয়োজন হইত। পুরোহিত ম্যানরবাসীদের নিকট হইতে তাহাদের আয়ের এক দশমাংশ আদায় করিতেন।

ম্যানরে বা দুর্গে অভিজাত শ্রেণী বেশ জাঁকজমকের সহিত জীবন যাপন করিতেন। বিরাট বাসভবনে প্রাচুর্যের মধ্যে তাঁহাদের দিন কাটিত। তাঁহাদের বাসভবনের ভিতরের ঘরগুলি ছিল বেশ অন্ধকার। সেইজন্য দিনের বেলাতেও মোমবাতি ও মাশাল জ্বালাইয়া ঘরগুলি আলোকিত করা হইত। শীত নিবারণের জন্য ঘরে চুল্লী জ্বালাইয়া রাখা হইত।

ম্যানরে সামন্ত বা অভিজাতশ্রেণীর প্রধান কাজ ছিল যুদ্ধ ও লুঠতরাজ। রাজার প্রয়োজনে তাঁহাদের যুদ্ধে যাইতে হইত অথবা রাজদরবারে উপস্থিত থাকিতে হইত। অবসর সময়ে তাঁহারা শিকারে যাইতেন। ম্যানরে বসবাসকারী অভিজাতগণ প্রায় সকলেই ছিলেন দক্ষ শিকারী। ইংলণ্ডের রাজা বিজয়ী উইলিয়ম তাঁহার লম্বা হরিণটিকে সন্তানের ন্যায় ভালবাসিতেন। তাঁহার পুত্র উইলিয়ম রুফাস শিকার করিতে গিয়া গুপ্তশত্রুর তীরে নিহত হন। বিজয়ী উইলিয়মের তৃতীয় পুত্র প্রথম হেনরী শিকারে দক্ষতার জন্য 'ফাউলার' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। শিকার করা সে সময়ে নিপুণ শিল্প হিসাবে পরিগণিত হইয়াছিল। সে সময়ে শিকারের জন্য ম্যানরের চারিদিকে বহু বন জঙ্গল সুরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা ছিল। এইসব বনজঙ্গলে অনধিকার প্রবেশ করিয়া বন্যপশু হত্যাকারীকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হইত। শিকারের যাবতীয় অধিকার ছিল সামন্ত প্রভুর।

ম্যানরে কৃষকদের সংখ্যাই ছিল অধিক। কৃষকেরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। এক শ্রেণীর কৃষককে বলা হইত 'ভিলেন' বা স্বাধীন কৃষক। তাহারা সামন্ত প্রভুর কতকগুলি কাজ করিয়া দিবার সর্তে অথবা ফসলের নির্দিষ্ট অংশ প্রদানের বিনিময়ে সামন্ত প্রভুর নিকট হইতে জমি গ্রহণ করিত। সামন্ত প্রভুর নির্দিষ্ট কাজ শেষ করিয়া তাহারা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিতে পারিত।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কৃষককে বলা হইত 'সার্ফ' বা ভূমি দাস। এই সার্ফ প্রথা বংশানুক্রমে চলিত। (সার্ফরা ছিল সামন্ত প্রভুর প্রায় ক্রীতদাস স্বরূপ। সামন্ত প্রভুরাই ছিলেন সার্ফদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। প্রত্যেক সার্ফই চাষ করার জন্য একটু জমি পাইত। সেই জমিতে সে তার নিজের হাল বলদ দিয়ে চাষ করিত। একটা সুবিধা ছিল যে সার্ফদের জমি কেহ কাড়িয়া লইতে পারিত না। কোন জমি বিক্রীত হইলে সেই জমির সহিত সংশ্লিষ্ট সার্ফরাও হস্তান্তরিত হইত। অভিজাত শ্রেণীর ঠিক বিপরীত ধরণের জীবনযাপন করিত সার্ফরা। ইহাদের না ছিল ভাল বাসস্থান, না ছিল খাওয়া-পরার উপযুক্ত সংস্থান। কঠোর পরিশ্রম করিয়া সামন্তপ্রভু ও গির্জার প্রাপ্য মিটাইয়া কোন রকমে ইহারা প্রাণ বাঁচাইয়া রাখিত।)

ম্যানরে চাষী ব্যতীত কামার, কুমোর প্রভৃতি নানা শ্রেণীর লোকেরা বাস করিত। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অধিকাংশই ম্যানরেই তৈয়ারী হইত। ফলে প্রত্যেকটি ম্যানরেই একটি করিয়া স্বতন্ত্র সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল। বাহিরের জগতের সহিত ম্যানরবাসীর বড় একটা সম্পর্ক ছিল না।

নবম পরিচ্ছেদ

সার্ফ বা ভূমিদাসদের অবস্থা

(মধ্যযুগে ইউরোপে সার্ফ বা ভূমিদাসদের অবস্থা ছিল বড়ই করুণ। সার্ফ ও ক্রীতদাস প্রায় একই পর্যায়ভুক্ত ছিল। সার্ফ ছিল তাহার মনিবের ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং তাহার মর্যাদা মনিবের গৃহপালিত পশুর

অপেক্ষা উন্নত ছিল না। স্বাধীনতা বলিয়া সার্ফদের কিছুই ছিল না। মনিবের অনুমতি ব্যতীত তাহারা জমি ছাড়িয়া কোথাও যাইতে পারিত না, বিনা মজুরিতে তাহাদের নিজ নিজ মনিবের খাসজমিতে চাষ করিতে হইত। মনিবের অনুমতি ব্যতীত তাহারা বিবাহ করিতে পারিত না, কোনরূপ ক্রয়-বিক্রয়ের অধিকারও তাহাদের ছিল না। অতএব তাহারা কোন সম্পত্তির অধিকারীও ছিল না। মনিবের বিরুদ্ধে কোন আদালতে তাহারা নালিশ করিতে পারিত না, মুখ বুজিয়া নীরবে মনিবদের সকল অত্যাচার তাহাদের সহ্য করিতে হইত। কখনও সার্ফরা কোন রকম অন্যায় করিলে মনিবের কাছারীতে তাহাদের বিচার হইত এবং মনিব ইচ্ছামত বেত্রাঘাত করিয়া তাহাদের শাস্তি দিতেন।

সার্ফরা ছিল নিজ নিজ মনিবের অধীনে নির্দিষ্ট চাষের জমির সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। সেই জমি ছাড়িয়া কোন সার্ফের কোথাও পলাইয়া যাইবার উপায় ছিল না। এইরূপ করিলে মনিব পলায়নপর সার্ফের পশ্চাদ্ধাবন করিতেন এবং ধরা পড়িলে তাহাকে ভীষণ শাস্তি পাইতে হইত।

মোট কথা মনিবের আদেশপালন ও তাঁহারচাষবাস করিয়া দেওয়াই ছিল সার্ফের পক্ষে বাধ্যতামূলক এবং সার্ফবৃত্তি ছিল বংশানুক্রমিক।

সামন্তপ্রভু তাঁহার ইচ্ছানুসারে সার্ফদের উপর কর ধার্য করিতে পারিতেন। ম্যানরে দেয় করের পরিমাণ অর্থ বা দ্রব্য সামগ্রীতেই নির্ধারিত হইত। বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন প্রত্যেক সামন্তপ্রভুই উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে তাহাদের নিজেদের স্বার্থেই সার্ফদের সন্তুষ্ট রাখা উচিত। তাই কিছু কিছু সামন্ত প্রভু সার্ফদের উপর যথেচ্ছ খাজনা বা কর ধার্য করিতেন না।

দশম পরিচ্ছেদ

ভুমিদাসত্ব হইতে মুক্তির বিভিন্ন উপায়

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রো দাসদের মুক্তি এবং খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীতে রুশ দাসদের মুক্তির ন্যায়

মধ্যযুগে ইউরোপে ভূমিদাসদের মুক্তির প্রচেষ্টা এক চমকপ্রদ ঘটনা।

যাজকদের একাংশ ভূমিদাসত্ব প্রথার উচ্ছেদ সাধনের পক্ষপাতী হইলেও কতিপয় বিশিষ্ট ধর্মীয় নেতা এই প্রথা রদ করিবার বিপক্ষে ছিলেন। ধর্মীয় জমিসমূহে নিযুক্ত ভূমিদাসগণ নানাভাবে নির্যাতিত হওয়ায় তাহারা মধ্যে মধ্যে বিদ্রোহী হইয়া উঠিত। কিন্তু তাহাদের তুলনায় জমিদারদের শক্তি অনেক বেশী ছিল। তাই তাদের বিদ্রোহ ব্যর্থ হইত। এই সময়ে পুরাতন শহরসমুহে শিল্প ও বাণিজ্যের পুনরাবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক কাজকর্ম ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয় এবং কৃষিজাত দ্রব্যাদির বাজার সৃষ্টি হয়। নূতন শহরসমূহে কৃষিজাত পণ্যের অতিরিক্ত চাহিদার ফলে ভূমিদাসদের পক্ষে যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করিয়া মুক্তিপণ সঞ্চয় করা সম্ভব হয়। তাহা ছাড়া, কৃষি-ভিত্তিক অর্থনীতি ক্রমে শিল্পভিত্তিক অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হওয়ায় ভূম্যধিকারীরা ভূমিদাসদের নিকট হইতে শ্রম ও উৎপন্ন শস্যাদির পরিবর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থগ্রহণ অধিকতর শ্রেয় মনে করতেন। কেননা তাঁহাদের পক্ষে ভাড়া করা দৈনিক মজুর কর্মে নিয়োজিত করা অধিক লাভজনক ছিল কারণ তাহাদের উৎপাদন ক্ষমতা ভূমিদাসদের ক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশী ছিল।

এইসব অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে দেশের সামাজিক পরিবর্তনও শুরু হয়। ভূমিদাসরা অনেকক্ষেত্রে নিজ নিজ প্রভুদের মুক্তিপণ দিয়া স্বাধীন হয়। অনেকে আবার নিজ নিজ প্রভুর সম্মতিক্রমে ধর্মীয় সংস্থায় যোগদান করিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। অনেক ভূমিদাস নিজ নিজ প্রভুর আশ্রয় হইতে পলায়ন করিয়া বাঁচে। নূতন নূতন শহরের আবির্ভাবের ফলে ভূমিদাসরা সামন্তদের অধীনে দুঃসহজীবন হইতে মুক্তি পাইবার জন্য পল্লী অঞ্চল হইতে শহরে পলাইয়া আসিত কারণ শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য শহরে বিকাশলাভ করিবার ফলে তাহাদের কর্ম সংস্থানের কোন অসুবিধা হইত না। তাহা ছাড়া, পল্লীর হারাইয়া

যাওয়া ভূমিদাসকে শহরের জনারণ্যে খুঁজিয়া পাওয়া সহজ ছিল না। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে নর্মান বিজয়ের সুযোগে ইংলণ্ডের বহু ভূমিদাস স্বাধীন হয়। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ক্রুসেডের উন্মাদনায় বহু সহস্র ভূমিদাস আকৃষ্ট হয়। এই যুদ্ধে যোগদান করিলে ভূমি-দাসদের প্রভুরা মুক্তি দিতে সম্মত হয়। তাহা ছাড়া দুঃসাহসিকতা ও গৌরব মিশ্রিত এই যুদ্ধ তাহাদিগকে মুক্তির নূতন দিগন্ত উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। ১৩৪৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে কাল মহামারী (Black death) এবং শতবৎসর ব্যাপী যুদ্ধের প্রভাব ভূমিদাসদের মুক্তির সম্ভাবনাকে উজ্জ্বলতর করিয়া তোলে। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ড, ফ্লাণ্ডার্স, বোহেমিয়া এবং জার্মানীতে প্রোটেস্টাণ্ট ধর্ম সম্প্রদায় পার্থিব সম্পদে সমৃদ্ধ ধর্মীয় সংস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে ধর্মীয় সংস্থায় যুক্ত অনেক ভূমিদাস মুক্তিলাভ করে।

অনুশীলনী

বাস্তব ভিত্তিক ও মৌখিক প্রশ্নাবলী

১। 'ফিউড' কথাটির অর্থ কি? ২। ফিউডাল দুর্গে পরিখার উপর সেতুকে কি বলা হইত? ৩। মধ্যযুগে ইউরোপে বর্মাচ্ছাদিত ঘোড়সওয়ারকে কি বলা হইত? ৪। 'রিচার্ড দ্য লায়ন' কোথাকার রাজা ছিলেন? ৫। উইলিয়ম রুফাসের পিতা কে ছিলেন? ৬। ম্যানর আদালতে কি কি বিষয়ের বিচার হইত? ৭। ট্রুবাডুর কাহাদের বলা হইত? ৮। করভি কি? ৯। 'সিভালরি' কথার অর্থ কি? ১০। 'স্কোয়ার' কাহাদের বলা হইত?

সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্নাবলী

১। 'ফিউডালিজম্' কথাটির অর্থ কি? ইউরোপে ফিউডালযুগ বলিতে কোন্ সময়টিকে ধরা হয়? ২। ফিউডালিজম্ বা সামন্ত প্রথার উদ্ভবের কারণগুলি বর্ণনা কর। ৩। ফিউডালিজম্ বা সামন্ত প্রথার ভূমির ভূমিকা কি ছিল? এই প্রথায় কিরূপ সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল? ৪। ফিউডাল বা সামন্ত দুর্গের বর্ণনা কর। ৫। মধ্যযুগে ইউরোপে সামন্তদের জীবনযাত্রা কিরূপ ছিল?

রচনাত্মক প্রশ্নাবলী

১। মধ্যযুগে ইউরোপে নাইট (Knight) কাহাদের বলা হইত? কি ভাবে তাহারা এই পদমর্যাদা লাভ করিত? নাইটদের কর্তব্য ও আদর্শ কি ছিল?

২। 'ম্যানর' কথাটির অর্থ কি? 'ম্যানর প্রথা' বলিতে কি বুঝায়? ম্যানরে জীবনযাত্রার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৩। ম্যানরে কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা বর্ণনা কর।

৪। মধ্যযুগের ইউরোপীয় সমাজে লোকেরা কি কি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল? প্রত্যেক শ্রেণীর জীবনযাত্রার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৫। মধ্যযুগের ইউরোপে সার্ফ ভূমিদাসদের সামাজিক অর্থ নৈতিক অবস্থা বর্ণনা কর।

৬। মধ্যযুগে ইউরোপে ভূমিদাসরা কি কি উপায়ে ভূমিদাসত্ব হইতে মুক্তির চেষ্টা করিয়াছিল?

অধ্যায় ৮

(ক্রুসেড প্রথম, তৃতীয় এবং চতুর্থ)

প্রথম পরিচ্ছেদ

ক্রুসেড ও তাহার উদ্দেশ্য

মধ্যযুগে ইউরোপের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ।

যীশুখৃষ্টের সমাধিস্থান জেরুজালেম ছিল খৃষ্টানদের পবিত্র তীর্থস্থান। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে এই পবিত্র নগরী আরব মুসলমানদের হস্তগত হয়। আরবরা খৃষ্টানদের ধর্মাচরণে বাধা দিত না। খৃষ্টীয় একাদশ শতকে সলজুক তুর্ক নামে এক তাতার জাতি জেরুজালেম অধিকার করে। এই তুর্কী মুসলমানেরা খৃষ্টান তীর্থযাত্রীদের প্রতি ভাল ব্যবহার করিত না। শুধু তাহাই নহে, খৃষ্টান তীর্থযাত্রীদের তাহারা মারধর করিত, কখনও বা কারাগারে তাহাদের বদ্ধ করিয়া রাখিত। যাত্রীরা দেশে ফিরিয়া

সেই সব অত্যাচারের কাহিনী শুনাইলে খৃষ্টান জগতে এক আন্দোলন দেখা দেয়। ইউরোপে রব উঠিল বিধর্মীদের কবল হইতে পুণ্যভূমি জেরুজালেম উদ্ধার করিতে হইবে।

এই সময়ে পিটার নামে ফ্রান্সের এক খৃষ্টান সন্ন্যাসী ইউরোপের সর্বত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া জেরুজালেম উদ্ধারের জন্য খৃষ্টানদের উত্তেজিত করিয়া তোলেন। রোমের খৃষ্টধর্মগুরু পোপ দ্বিতীয় আরবানও এক মহাসভা আহ্বান করিয়া ঘোষণা করিলেন যে বিধর্মীদের হাত হইতে জেরুজালেম উদ্ধার করা প্রত্যেক খৃষ্টানদের প্রধান কর্তব্য। ইউরোপের চারিদিকে সাড়া পড়িয়া গেল। পোপের নির্দেশ পাইয়া ইউরোপের জনসাধারণ, সামন্তবর্গ, ব্যবসায়ীশ্রেণী এমন কি রাজারাও জেরুজালেম উদ্ধারের জন্য তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। খৃষ্টানদের এই যুদ্ধ 'ক্রুসেড' বা 'ধর্মযুদ্ধ' নামে অভিহিত। খৃষ্টান যোদ্ধাদের ঢালে পবিত্র ক্রুশ চিহ্ন অঙ্কিত থাকিত বলিয়া এই যুদ্ধকে ক্রুশের যুদ্ধ বা ক্রুসেড' বলা হইয়া থাকে। প্রায় দুইশত বৎসর ধরিয়া এই ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ চলে। তবে তৃতীয় ও চতুর্থ ক্রুসেড মধ্যযুগে ইউরোপের ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছে।

প্রথম ক্রুসেড ঃ ১০৯৫ খৃষ্টাব্দে ক্রুসেডের প্রথম অভিযান শুরু হয়। এই অভিযানে খৃষ্টানরা দলে দলে যোগদান করে। কিন্তু তাহাদের না ছিল যুদ্ধের অভিজ্ঞতা না ছিল অস্ত্রশস্ত্র। এই ক্রুসেড পরিচালনা করেন ইংলণ্ডের রাজা প্রথম উইলিয়মের পুত্র নর্মাণ্ডির ডিউক রবার্ট আর অন্যান্য দেশের দুই তিন জন সম্ভ্রান্ত রাজকুমার। সাধু পিটারও হাজার হাজার সঙ্গী লইয়া এই ক্রুসেডে যোগদান করেন। ১০৯৯ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টানরা জেরুজালেম অধিকার করে। এখানে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নগরটিকে সুরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করা হয়। ১১৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জেরুজালেম-খৃষ্টানদের অধিকারে থাকে।

তৃতীয় ক্রুসেড ঃ ১১৮৭ খৃষ্টাব্দে মিশরের তুর্কী সুলতান সালাদিন জেরুজালেম অধিকার করে। এই সংবাদে সারা ইউরোপ চঞ্চল হইয়া

উঠে। জেরুজালেম উদ্ধারের জন্য রোমের পোপ অষ্টম গ্রেগরী আবার ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেন। ইহাই ছিল তৃতীয় ক্রুসেড (১১৮৭ খৃষ্টাব্দে)। এই ক্রুসেডে যোগদান করেন ইউরোপের বিশিষ্ট নরপতিগণ। তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ইংলণ্ডের রাজা প্রথম রিচার্ড, জার্মান সম্রাট ফ্রেডারিক বারবরোসা এবং ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ অগস্টাস।

জার্মান সম্রাট বারবরোসার বয়স তখন ছিল সত্তরের উপর। বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তিনি স্থলপথে এশিয়া মাইনরে উপস্থিত হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় জেরুজালেমের নিকট একটি পার্বত্য নদী পার হইবার সময়ে তিনি জলে ডুবিয়া মারা যান এবং তাঁহার সৈন্যদল জার্মানীতে ফিরিয়া আসে।

ইংলণ্ডের রাজা প্রথম রিচার্ড ছিলেন এক বীর যোদ্ধা। এইজন্য তিনি 'সিংহপ্রাণ' রিচার্ড নামে খ্যাত ছিলেন। ক্রুসেড যাত্রার ব্যয় সংগ্রহের জন্য তিনি বহু নগরবাসীকে নানা বিষয়ে স্বাধীনতার চার্টার বা সনদ দিয়াছিলেন। এমন কি তিনি বলিয়াছিলেন, উপযুক্ত অর্থ পাইলে আমি লণ্ডন নগরীও বিক্রয় করিতে প্রস্তুত আছি। ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ অগস্টাসের সহিত যৌথভাবে রিচার্ড সমুদ্রপথে যাত্রা করিয়া ভূমধ্যসাগরের উপকূলে একটি নগর অবরোধ করেন। কিন্তু শীঘ্রই উভয়ের মধ্যে মনান্তর হইলে ফিলিপ ফ্রান্সে ফিরিয়া আসেন। রিচার্ড শেষপর্যন্ত একাই ইংরাজ সৈন্যদের লইয়া বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্যালেস্টাইনের কিছু অংশ উদ্ধার করেন। অবশ্য জেরুজালেম মুসলমানদের হাতেই থাকিয়া যায়।

রিচার্ডের প্রতিদ্বন্দ্বী সালাদিন ছিলেন যেমনই বীর, তেমনই মহৎ। এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা পরস্পরকে শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহাদের পরস্পরের বন্ধুত্ব সম্বন্ধে বহু কাহিনী শোনা যায়। কথিত আছে, রিচার্ড প্যালেস্টাইনে একবার অসুস্থ হইয়া পড়িলে সালাদিন রিচার্ডের জন্য চিকিৎসক এবং পাহাড়ের উপর হইতে সংগৃহীত বরফ পাঠাইয়াছিলেন। তৃতীয় ক্রুসেডের কাহিনী রিচার্ড ও সালাদিনের বীরত্বের কাহিনী। দুই বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ করিয়া শেষ পর্যন্ত সালাদিনের সঙ্গে সন্ধি করিয়া

রিচার্ড স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন। ফিরিবার পথে অষ্ট্রীয়ার রাজা ষষ্ঠ হেনরী তাহাকে বন্দী করেন। অবশেষে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে তিনি মুক্তি পাইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। তৃতীয় ক্রুসেডের ফলে খৃষ্টান তীর্থযাত্রীরা অবাধে জেরুজালেম যাইবার সুযোগ সুবিধা লাভ করে।

চতুর্থ ক্রুসেড: চতুর্থ ক্রুসেড অনুষ্ঠিত হয় ১২০১ খৃষ্টাব্দে। এইটি ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মযুদ্ধ। পোপ তৃতীয় ইনোসেণ্ট এই ক্রুসেডের আহ্বান জানান। বহু ফরাসী নাইট এবং ইংলণ্ড, জার্মানী প্রভৃতি দেশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা এই ক্রুসেডে যোগদান করেন। ১২০৪ খৃষ্টাব্দে ক্রুসেডারগণ বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল অধিকার করেন। তিনদিন ধরিয়া লুণ্ঠন, হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসলীলা চলিতে থাকে। ভেনিস নগরীর অধিবাসিগণ এই ক্রুসেডে যোগদান করিয়াছিল। রাজ্যবিস্তারের আশা লইয়াই তাহারা এই যুদ্ধে যোগদান করে এবং ক্রুসেডারগণও এবিষয়ে ভেনিসকে সমর্থন করে। ইহা হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, পরবর্তীকালে ক্রুসেডের প্রেরণা স্তিমিত হইয়া আসে, ক্রুসেডারগণ রাজ্যজয়ের বাসনায় মত্ত হইয়া উঠে। ফলে ধর্মযুদ্ধ আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের রূপ পরিগ্রহ করে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সমাজ ও সংস্কৃতির উপর ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের প্রভাব

ক্রুসেডের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইলেও ক্রুসেড পশ্চিম ইউরোপের সমাজ ও সংস্কৃতির উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

প্রথমতঃ, ক্রুসেডের ফলে খৃষ্টান জগতে পোপের প্রাধান্য বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। পোপ ক্রুসেড আহ্বান করিয়া দেশবাসীকে এক নবীন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেন।

দ্বিতীয়তঃ, ক্রুসেডের ফলে ইউরোপে সামন্তপ্রথা দুর্বল হইয়া পড়ে এবং রাজশক্তি পুনরায় মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়। বহু সামন্ত ক্রুসেডে যোগদান করিয়া মৃত্যুবরণ করিলে উত্তরাধিকারীর অভাবে তাঁহাদের অনেকের ভূসম্পত্তি পুনরায় নিজ নিজ রাজার নিকট ফিরিয়া আসে।

তৃতীয়তঃ, বহু ভূমিদাস ক্রুসেডের ফলে তাহাদের নিজ নিজ সামন্ত প্রভুর নিকট হইতে মুক্তির সুযোগ পাইয়াছিল। তাহা ছাড়া, এই সময়ে বহু শহরের উদ্ভব ও শিল্পের বিকাশের ফলে অসংখ্য সার্ফম্যানর হইতে সহজে পলায়নের পথ খুঁজিয়া পাইয়াছিল।

চতুর্থতঃ, ক্রুসেডের ফলে সমাজে স্ত্রীলোকের মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কেননা ক্রুসেডে অংশগ্রহণকারী ভূমির মালিকদের অনুপস্থিত কালে ভূমি সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবস্থা ও তদারকী মালিকদের স্ত্রীদেরই করিতে হইয়াছিল।

পঞ্চমতঃ, ক্রুসেডের ফলে প্রাচ্যের গ্রীক ও মুসলমানদের সহিত পশ্চিম ইউরোপের যোগাযোগ ঘটে এবং এই যোগাযোগের ফলে পশ্চিম ইউরোপের জনগণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রারও বিশেষ পরির্তন লক্ষিত হয়। পশ্চিম ইউরোপে পূর্বাঞ্চলের খাদ্য ও দ্রব্য সামগ্রীর প্রচলন হয়। প্রাচ্য দেশগুলির নিকট হইতেই ইউরোপীয়রা জানিয়াছিল যে গম ও সরিষা বসন্ত ও শীতকালে অর্থাৎ বৎসরে দুইবার চাষ করা যায়। ক্রুসেডের ফলে চাউল, ইক্ষু, ভুট্টা, লেবু, তরমুজ প্রভৃতি প্রাচ্যের খাদ্য-দ্রব্য ইউরোপে ব্যবহৃত হইতে থাকে। তাহা ছাড়া, প্রচ্যের অনুকরণে পশ্চিম ইউরোপের জনগণ লম্বা ঝুলওয়ালা জামা পরিতে এবং লম্বা দাড়ি রাখিতে আরম্ভ করে। ইউরোপের বাজারে প্রাচ্যে ব্যবহৃত কার্পাসজাত বস্ত্রাদি, মসলিন, কম্বল, কার্পেট প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হইতে দেখা যায়। ক্রুসেডের ফলে বিবিধ রঙ, ঔষধপত্র, মশলা, সুগন্ধি দ্রব্য, আয়না. কাঁচ, স্বর্ণ, রৌপের উপর এনামেলের কাজ প্রভৃতি ইউরোপীয় সমাজে প্রচলিত হয়। আরবদের নিকট হইতে হাওয়াকলের ব্যবহার শিখিয়া ইউরোপীয়েরা পূর্ব অপেক্ষাও তাড়াতাড়ি সম্য চূর্ণ করিয়া ময়দা তৈয়ারী করিতে শিখিল।

ষষ্ঠতঃ. ক্রুসেডের ফলে মধ্যযুগের ইউরোপবাসীরা এশিয়াবাসীদের নিকট হইতে বিভিন্ন দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প ও বাণিজ্যের পরিচয় লাভ করে। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে প্রাচ্যের সংস্কৃতি ও সভ্যতা ইউরোপীয়দের হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা দূরীভূত করিয়া উহা উদারতায়

প্রসারিত করিয়া তুলিতে সাহায্য করে। ফলে মধ্যযুগের নিষ্ঠুরতা ও অসভ্যতা হ্রাস পাইবার মূলে ক্রুসেডের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না।

সপ্তমতঃ, পাশ্চাত্যের সাহিত্যজগতে ক্রুসেডের প্রভাব অনস্বীকার্য। ইংলণ্ডের কবি চসার এবং ইটালীর কবি দান্তের কাব্যসৃষ্টিতে ক্রুসেডের প্রভাব লক্ষণীয়। ক্রুসেডের আখ্যায়িকাসমূহ হইতে ইতিহাস রচনায় অভূতপর্ব উৎসাহ দেখা যায়। চতুর্থ ক্রুসেডের পর এ্যারিস্টটলের রচনা মূল গ্রীক হইতে করেকটি ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। চিকিৎসাক্ষেত্রে মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্বের ফলে কতিপয় চিকিৎসককে পশ্চিম ইউরোপে সাদর আহ্বান জানানো হইয়াছিল।

অষ্টমতঃ, পশ্চিম ইউরোপের সামরিক বিদ্যায় ক্রুসেডের গভীর প্রভাব দেখা যায়। প্রাচ্যের বিশাল প্রাচীর বেষ্টিত দুর্গ এবং অবরোধ কৌশল পশ্চিম ইউরোপে প্রবর্তিত হয়। ইহা ছাড়া, ক্রুসেডের ফলে বিশাল ধনুক, নাইট ও উহার অশ্বের জন্য ভারী অস্ত্রশস্ত্র এবং সংবাদবাহক পারাবতের প্রচলন ইউরোপে আরম্ভ হয়।

নবমতঃ, পশ্চিম ইউরোপের স্থাপত্যেও ক্রুসেডের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ক্রুসেডের ফলে গোল গম্বুজ বিশিষ্ট ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়। লণ্ডনের 'গ্রেট টেম্পল চার্চ' এবং কেম্ব্রিজের 'হোলি চার্চ' জেরুজালেমের গির্জার অনুকরণে নির্মিত হইয়াছিল।

দশমতঃ, ক্রুসেড অভিযানের ফলে হসপিটালার (Hospitaler) এবং টেম্পলার (Templer) নামে দুইটি সামরিক সঙ্ঘের উদ্ভব হয়। দুটি সঙ্ঘই ক্রুসেডে আহত সৈনিকদের সেবা শুশ্রূষা করিত, ইহা ছাড়া খৃষ্টান তীর্থযাত্রীদের তত্ত্বাবধানও করিত।

পরিশেষে ক্রুসেডের ফলে পূর্ব ও পশ্চিমের সংযোগ স্থাপিত হয় এবং ইহার ফলে প্রাচ্যের সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রতীচ্যে বিশেষভাবে প্রসার লাভ করে। আরবদের নিকট হইতে চৌম্বকের এবং কম্পাসের ব্যবহার শিখিয়া ইউরোপীয়েরা তাহাদের সমুদ্র যাত্রা পূর্বাপেক্ষা অনেক নির্বিঘ্ন করিতে পারিয়াছিল। ক্রুসেডের ফলে এশিয়া ও

ইউরোপের মধ্যে যাতায়াতের পথ সুগম হয়, পশ্চিম ইউরোপের জনগণের ভৌগোলিক জ্ঞান বৃদ্ধি পায়, পৃথিবী পর্যটনে তাহারা নূতন্ প্রেরণা লাভ করে এবং জাতিতে জাতিতে মিলনের ফলে তাহাদের মানসিক উৎকর্ষ সাধিত হয়।

মধ্যযুগের ইউরোপের ইতিহাসে ক্রুসেড কেবলমাত্র ধর্মের উন্মাদনা সৃষ্টি করিয়াই খ্যাতিলাভ করিয়াছিল তাহা নহে, ক্রুসেড ধর্মযুদ্ধের নামে সমগ্র ইউরোপকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার এক নূতন দিগন্ত খুলিয়া দিয়া এক নূতন যুগের সূচনা করিয়াছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ক্রুসেডের ফলে নূতন শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্রের উদ্ভব—কৃষি ও কুটিরশিল্পের পৃথকীকরণ

ক্রুসেড কেবলমাত্র পশ্চিম ইউরোপের সমাজ ও সংস্কৃতিতেই প্রভাব বিস্তার করে নাই, ইহা ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারে এবং নূতন নূতন নগর সৃষ্টিতেও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

ক্রুসেডের ফলে পশ্চিম ইউরোপে বহু নূতন নগর ও বাণিজ্যেকেন্দ্র গড়িয়া উঠে। এই সময়ে এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে বাণিজ্যের প্রবর্তন হয়। ফ্ল্যাণ্ডার্স ও দক্ষিণ-পশ্চিম জার্মানীতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই দেখা গেল অনেকগুলি সমৃদ্ধ নগর। ইটালীতে ভেনিস, জেনোয়া, পিসা প্রভৃতি নূতন নগরের সৃষ্টি হয় এবং এই নগরগুলি বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে খ্যাতিলাভ করে। ক্রুসেডের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের বিনময়ে বহু নগর স্বায়ত্ত শাসন লাভ করে।

পশ্চিম ইউরোপে উৎপাদিত প্রচুর দ্রব্যসামগ্রীর ভাল বাজার পূর্বাঞ্চলে ছিল না। ক্রুসেডের ফলে পশ্চিম ইউরোপের সহিত পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ সংগঠিত হয় এবং পূর্বাঞ্চলের দ্রব্য সামগ্রীর সহিত তাহার পরিচয় ঘটে। ফলে পশ্চিম ইউরোপ পূর্বাঞ্চলের দ্রব্য

সামগ্রীর অফুরন্ত বাজারে পরিণত হয়। ইটালীর শহরসমূহের বাণিজ্যিক তৎপরতা আল্পস পর্বত অতিক্রম করিয়া জার্মান, ফরাসী ও বেলজিয়ামের শহরসমূহে প্রসারিত হয়। চতুর্থ ক্রুসেডের পর পশ্চিম ইউরোপ ভূ-মধ্য-সাগরে নৌ আধিপত্য লাভ করে এবং ইহার ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে বাণিজ্যের মধ্যবর্তী কেন্দ্ররূপে কনস্টান্টিনোপলের প্রাধান্যের অবসান ঘটে। অতঃপর ভেনিস ও জেনোয়ার বাণিজ্য জাহাজ অবলীলাক্রমে কৃষ্ণসাগরে যাতায়াত করিতে থাকে এবং রাশিয়া ও মধ্য এশিয়ার দ্রব্য সামগ্রী বিনাবাধায় পশ্চিম ইউরোপে আমদানী করিতে থাকে।

ক্রুসেডের ফলে পশ্চিম ইউরোপে কৃষিকার্যের প্রভূত উন্নতি দেখা যায়। শহরগুলিতে এবং দূরবর্তী বাজারসমূহে কৃষিজাত দ্রব্যের ব্যাপক চাহিদা মিটাইতে কৃষিতে অতিরিক্ত সময় ও উন্নততর চাষের পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়। রোম সাম্রাজ্যের গৌরবময় যুগের অবসানের পর পশ্চিম ইউরোপে এই প্রথম অতিরিক্ত শস্যের চাহিদা দেখা যায়! ফলে শুধু কৃষিজাত দ্রব্যই নহে, শিল্পজাত দ্রব্যেরও চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এই সময়ে কুটির শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটে। পূর্বে ভূমিদাসগণ কৃষিকার্যের অবসরে কাঠ খোদাই, চামড়ার কাজ, বস্ত্রবয়ন ও মৃৎপাত্র নির্মাণ প্রভৃতি কুটির শিল্পে নিজেদের নিয়োজিত করিত! কুটির শিল্পজাত এই দ্রব্যসমূহ স্থানীয় বাজারে বিক্রয় হইত। কিন্তু ক্রুসেডের ফলে নূতন নূতন নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপিত হওয়ায় এবং বিদেশের বাজারে কুটির শিল্পজাত দ্রব্যের এবং কৃষিজাত পণ্য সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষির সঙ্গে সঙ্গে কুটির শিল্পের কাজ সম্ভব হইয়া উঠে না। সেইজন্য পশ্চিহ ইউরোপে খৃষ্টীয় একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে দেখা যায় কুটির শিল্প কৃষি হইতে পৃথক হইয়া স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে.

অনুশীলনী

বাস্তব ভিত্তিক ও মৌখিক প্রশ্নাবলী

১। যীশুখ্রীষ্টের সমাধিস্থান কোথায়? ২। পিটার কে? ৩। ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ কতকাল ব্যাপীয়া চালিয়াছিল? ৪। প্রথম ক্রুসেড কে পরিচালনা করিয়াছিলেন? ৫। কোন্ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ক্রুসেডের অভিযান শুরু হয়? ৬। ফিলিপ অগস্টাস কোথাকার রাজা ছিলেন? ৭। 'সিংহপ্রাণ' বলিয়া কোন্ রাজা খ্যাত ছিলেন? ৮। চসার কোন্ দেশের কবি ছিলেন? ৯। ডিউক রবার্টের পিতার নাম কি ছিল? ১০। চতুর্থ ক্রুসেডের সময় রোমের পোপ কে ছিলেন?

সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্নাবলী

১। ক্রুসেড কি? ক্রুসেডের উদ্দেশ্য কি ছিল? ২। প্রথম ক্রুসেডের বর্ণনা কর। ৩।তৃতীয় ক্রুসেডে ইউরোপের কোন্ কোন্ নরপতি যোগ দিয়াছিলেন? ৪। 'সিংহপ্রাণ' রিচার্ড ও সলাদিনের সম্পর্ক কিরূপ ছিল? ৫। চতুর্থ ক্রুসেডের বর্ণনা দাও। চতুর্থ ক্রুসেডের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ছিল?

রচনাত্মক প্রশ্নাবলী

১। ক্রুসেডগুলির (প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ) বর্ণনা দাও।

২। মধ্যযুগীয় পশ্চিম ইউরোপের সমাজ ও সংস্কৃতির উপর ক্রুসেডের প্রভাব বর্ণনা কর।

৩। ক্রুসেডের ফলে কিভাবে নূতন শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছিল?

৪। ক্রুসেডের ফলে কৃষি ও কুঠির শিল্প পৃথকীকরণের প্রয়োজন হইল কেন?

অধ্যায় ৯

মধ্যযুগে ইউরোপে নগর

প্রথম পরিচ্ছেদ

মধ্যযুগে ইউরোপে নগরের বিকাশ : ক্রুসেড গিল্ডের ভূমিকা

বর্বর জার্মানদের অক্রমণে রোম সাম্রাজ্যের নগরগুলি ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল! ফলে ইউরোপের অর্থনৈতিক অবস্থার ব্যাপক অবনতি হয়। ইহার পর খৃষ্টীয় একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লবের ফলে ইউরোপের নানা স্থানে নূতন নূতন নগর গড়িয়া উঠে। এই সব নগরগুলির উৎপত্তির বহু কারণ ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, নূতন নূতন বাণিজ্য কেন্দ্রের উদ্ভব,



কৃষি ও শিল্পের উন্নতি, বড় বড় হাট বাজার ও গির্জা স্থাপন প্রভৃতি নগর উৎপত্তির মূল কারণ। বড় বড় হাট বাজার কেনাবেচার জন্য এবং ধর্ম অর্জনের জন্য গির্জায় বহু লোকের সমাগম হইত। এই সব লোকের খাওয়া থাকার জন্য দোকানপাট, হোটেল ইত্যাদি স্থাপিত

হইল। এই হাটবাজার ও গির্জাকে কেন্দ্র করিয়া ধীরে ধীরে নগর গড়িয়া উঠিল। কোথাও বর্বর জার্মানগণ শান্ত জীবনযাত্রা আরম্ভ করিলে পুরাতন রোমান নগরগুলি নূতন করিয়া গড়িয়া উঠিতে থাকে। কোথাও আবার বিত্তশালী সামন্ত প্রভুদের দুর্গের সন্নিহিত অঞ্চলে নগর গড়িয়া উঠিতে দেখা যায়। ইহা ছাড়া, ধর্মাধিষ্ঠানের অধিকারভুক্ত স্থান-সমূহের শাসন কার্যের কেন্দ্ররূপে বহু নগরের উৎপত্তি হয়। বিশপ ও অন্যান্য যাজকদের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী পাইবার উপযোগী বাজার, শস্যাদি মজুদ করিবার জন্য গুদাম ঘর, বিদ্যালয়, শাসকার্যে ও সামরিক দায়িত্বে নিযুক্ত বিশপের কর্মচারী, ও তাহাদের বাসস্থান, যাজকদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করিবার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারিগরের সমাবেশ ইত্যাদি মিলিত হইয়া ক্রমে নগরের সূচনা করে।

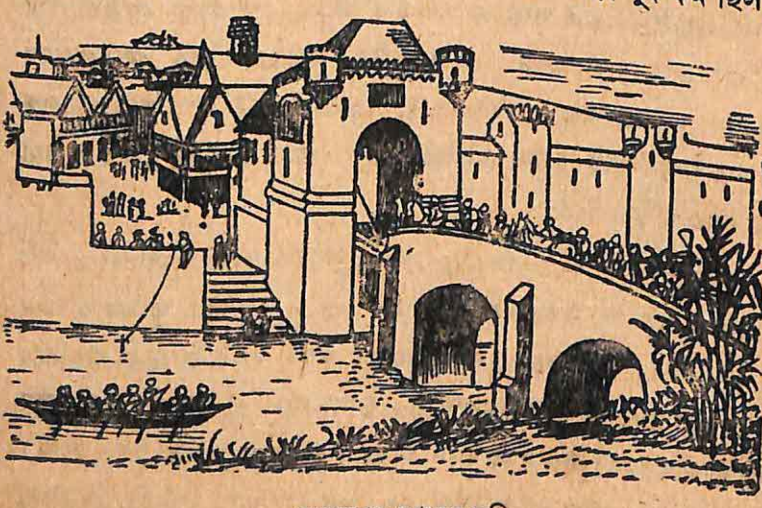
মধ্যযুগে ইউরোপে নগরের উৎপত্তি ও বিকাশে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের ভূমিকা অস্বিকার করা যায় না। ক্রুসেডের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য অভাবনীয় রূপে বৃদ্ধি পায় এবং ইহার ফলে নানাস্থানে বাণিজ্যকেন্দ্র গড়িয়া উঠে। ইহাছাড়া, জেরুজালেম যাওয়ার পথে ধর্মযোদ্ধাদের খাওয়া থাকার জন্য দোকান-পাট, হোটেল, নানাদ্রব্য সামগ্রার জন্য বাজার ইত্যাদি বহু স্থানে স্থাপিত হয়। ক্রমে ইহাদের কেন্দ্র করিয়া বহু নগর গড়িয়া উঠে।

সহর গুলির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ঠ্য ছিল নানা ধরণের সংঘ বা গিল্ড গঠন। শহর গঠনে এই সব সঙ্ঘ বা গিল্ডের ভূমিকাও কম নহে। মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপের বহু স্থানে একই কাজ বা ব্যবসায়ে নিযুক্ত কারিগর ও বণিক পারস্পরিক সুযোগ-সুবিধা ও সমান্তদের জুলুম হইতে আত্মরক্ষার জন্য সঙ্ঘ গঠন করিত। এই সঙ্ঘকে বলা হইত গিল্ড। এক এক বৃত্তি লইয়া গঠিত হইত এক এক 'গিল্ড'। তাঁতি, কামার, কুমোর, ছুতার, মুচি, মাংসওয়ালা প্রভৃতি প্রত্যেক শ্রেণীর লোকদেরই পৃথক পৃথক 'গিল্ড' গঠিত হইয়াছিল। প্রত্যেক গিল্ডের একটি করিয়া হলঘর থাকিত। সঙ্ঘের সভাপতিকে বলা হইত অল্ডারম্যান। 'গিল্ড'

গঠনের উদ্দেশ্য ছিল নিজ নিজ ব্যবসার নিয়ম কানুন রচনা করা, শুল্কের হার লইয়া সমান্তদের সঙ্গে যৌথভাবে আবেদন নিবেদন করা এবং চুরি ডাকাতির হাত হইতে সঙ্ঘবদ্ধভাবে আত্মরক্ষা করা। প্রত্যেক শ্রেণীর 'গিল্ড' নিজ কারবারের প্রসার কল্পে নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করিত এবং এই নিয়ম ভঙ্গ করিলে অপরাধীকে শাস্তি দিত। কোনও দোকানদার ভেজাল দ্রব্য বিক্রয় করিলে অথবা রবিবারে পর্বদিনে বা রাত্রিকালে কেহ কাজ করিলে 'গিল্ড' তাহার শাস্তির ব্যবস্থা করিত। কারিগর বণিকদল সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার ফলে নগরগুলি ক্রমশঃ বিকাশ লাভ করে এবং শক্তিশালী হইয়া উঠে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
মধ্যযুগে ইউরোপের নগর-জীবনের কথা

মধ্যযুগে ইউরোপের নগরগুলি ছিল আজকালকার নগরের চেয়ে অনেক ছোট। ছোট হইলেও নগরগুলিতে লোকসংখ্যা খুব কম ছিল



মধ্যযুগের নগরের ছবি

না। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ফ্লোরেন্স, ভেনিস্ ও মিলান নগরের লোকসংখ্যা ছিল প্রায় এক লক্ষ এবং প্যারিসের লোকসংখ্যা ছিল প্রায় দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার।

মধ্যযুগে নগরগুলির নিরাপত্তার জন্য প্রায়ই প্রাচীর দিয়া ঘেরা থাকিত। প্রাচীরের মধ্যে নগরে প্রবেশ করিবার কয়েকটি প্রবেশদ্বার ছিল। প্রবেশ দ্বারগুলি রাত্রে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইত। নগরের প্রধান ফটকের বাহিরে ছিল ফাঁসীকাষ্ঠ। ফাঁসীকাষ্ঠে দুই একটি শব সকল সময়েই ঝুলান থাকিত এবং কাকেরা এই শব ঠোকরাইতেছে দেখা যাইত অথবা ফটকের উপর লৌহ শলাকায় অপরাধীদের খণ্ডিত মস্তক গ্রথিত থাকিত। নগরের চারিধারের প্রাচীরের বহির্ভাগে এক গভীর জলপূর্ণ পরিখা নগরকে বেষ্টন করিয়া থাকিত। প্রাচীরের উপরিভাগে তিন শত ফুট দূরে দূরে এক একটি গম্বুজ থাকিত। পরিখার উপর 'ড্র-ব্রিজ' দিয়া নগরের প্রবেশদ্বারে পৌঁছান যাইত।

নগরের রাস্তাগুলি ছিল সরু ও আঁকাবাঁকা। রাস্তার দুইপাশে ছিল ঘেঁষাঘেঁসি তৈয়ারী চার-পাঁচতলা কাঠের বাড়ি। সেইজন্য রাস্তায় আলোবাতাস প্রবেশ করিবার উপায় ছিল না। নগরের প্রধান রাস্তাগুলি ছিল পাথর বাঁধানো। পাথর বাঁধানো রাস্তা সর্বপ্রথম ইটালীতে প্রবর্তিত হয়। দ্বাদশ শতাব্দীতে প্যারিসে এবং চতুর্দশ শতাব্দীতে জার্মানীর প্রধান রাস্তাসমূহ পাথর দিয়া তৈয়ারী হয়। নগরের বেশীর ভাগ রাস্তাই ছিল কাঁচা। বর্ষায় কাঁচা রাস্তায় কাদা জমিত প্রচুর। নগরবাসীদের তখন পথ চলা খুব কষ্টকর হইত।

নগরের পরিবেশ ছিল অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। রাস্তায় আবর্জনা পরিষ্কারের বা জল নিষ্কাশের কোন ব্যবস্থা ছিল না। ফলে অধিকাংশ সময়ে নগরের রাস্তাগুলি দুর্গন্ধ ও আবর্জনাপূর্ণ থাকিত। রাস্তায় কুকুর ও শূকর অবাধে বিচরণ করিত। গাড়ি, ঘোড়া ও পথিক সরু রাস্তায় ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া যাতায়াত করিত।

রাত্রিকালে রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা ছিল না। কেবল বড় বড় হোটেলের প্রবেশদ্বারের সম্মুখে রাত্রিকালে লণ্ঠন ঝুলিতে দেখা যাইত। রাত্রে পাহারাদাররা লম্বা লাঠির আগায় লণ্ঠন বাঁধিয়া রাস্তায় টহল দিত। পাহারাদাররা প্রায় সকলেই ছিল বৃদ্ধ: সেইজন্য চোর-ডাকাতরা ইহাদের ভয় করিত না।

নগরের জীবন ছিল গ্রামের জীবন হইতে ভিন্নতর। নগরের অধিবাসীরা বেশীর ভাগ ছিল বণিক ও কারিগর শ্রেণীর লোক। সুতরাং নগরের অধিবাসীদের অবস্থা সচ্ছল ছিল। নগরে একাধিক ধনী বণিক ছিল। তাহারা প্রচুর অর্থ উপার্জন করিত। নগরে মুচি, তাঁতী, ছুতার, কামার, কুমোর, স্বর্ণকার প্রভৃতির বাস ছিল। তাহারা সকলেই নিজ নিজ দোকানে জিনিসপত্র প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিত। এখানকার হাটে-বাজারে দূর দূর অঞ্চল হইতে পণ্য আসিত। মালপত্রের আনাগোনা ও টাকাপয়সা লেনদেনে নগরের বাজার সরগরম হইয়া থাকিত। ভ্রাম্যমাণ বণিকদল অবশ্য 'টোল' বা 'ট্যাক্স' না দিয়া নগরে প্রবেশ করিতে পারিত না। গ্রামবাসীরা নগরের বাজারে কেনাকাটা করিতে আসিত এবং গ্রামের উৎপন্ন কিছু কিছু জিনিস বাজারে বেচিয়া যাইত। বাজারের দোকানগুলি তাহাদের বিক্রয়ের দ্রব্যের একটি পরিচয় নিজ নিজ দোকানের সম্মুখে ঝুলাইয়া রাখিত। যেমন মুচির দোকানে টাঙ্গানো থাকিত একটা বড় জুতা, নাপিতরা তখন অস্ত্রচিকিৎসা করিত বলিয়া তাহাদের দোকানের সামনে ঝুলান থাকিত রক্তমাখা কাপড়।

বড় বড় নগরে স্কুল, কলেজ, গীর্জা, মঠ, 'টাউন হল,' 'গিল্ড হাউস' প্রভৃতি ছিল। বাহিরে লোকদের সাময়িক বসবাসের জন্য নগরে কয়েকটি সরাইখানাও ছিল। রাত্রে এই সব সরাইখানায় মদ্যপান ও হৈ-হুল্লোড় চলিত।

কখনও কখনও নগরে মেলা বসিত। মেলায় নানাদেশ হইতে হরেক রকমের জিনিসের আমদানী হইত। বেচা-কেনার ধুম পড়িয়া যাইত।

নগরগুলিতে ক্রীড়াকৌতুকের অভাব ছিল না। যাদুকরের খেলা, কুকুরের দৌড়, মোরগের লড়াই, নাচ-গান, অভিনয় ইত্যাদি প্রায় লাগিয়াই থাকিত।

নগরের মেয়র বা শাসনকর্তা এবং তাঁহার অনুচরেরা জমকালো পোষাক পরিয়া যখন শোভাযাত্রা করিয়া রাস্তায় বাহির হইতেন তখন

সবাই তাঁহাদিগকে সম্মান করিত। শহরের ম্যাজিস্ট্রেট, বিচারক প্রভৃতি নিয়োগ, কর-স্থাপন ও সামরিক ব্যবস্থা-তিনিই করিতেন।

নগরের ভিতর নানারকম হাঙ্গামা ও উপদ্রব লাগিয়া থাকিত। সামান্য ব্যাপার লইয়া নাগরিকদের মধ্যে প্রায়ই দাঙ্গা বাধিত। চোর-ডাকাতরা রাত্রির অন্ধকারে পথিকদের উপর চড়াও হইত।

মধ্যযুগে নগরগুলিতে প্লেগ ও অন্যান্য সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল এবং মধ্যে মধ্যে মড়ক লাগিয়া বা কাঠের ঘরবাড়িতে আগুন ধরিয়া নগর জনশূন্য হইয়া যাইত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মধ্যযুগে ইউরোপে রাজকীয় সনন্দের বলে নগরের স্বাধীনতা লাভ ও 'বুর্জোয়া' শব্দের উৎপত্তি

সামন্তদের জুলুম ও দস্যুদের উৎপাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য মধ্য যুগে ইউরোপে বিভিন্ন দেশের বণিক ও কারিগররা যেমন সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছিল ইউরোপের বিভিন্ন নগরের অধিবাসীরা তেমনি রাজা বা সামন্তপ্রভুদের কর্তৃত্ব হইতে মুক্ত হইবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছিল। বিত্তশালী বণিকদের 'গিল্ড'গুলিও নগরের স্বাধীনতা লাভে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ইউরোপে সামন্ত প্রভুরা যেমন রাজার দুর্বলতার সুযোগ লইয়া রাজকীয় ক্ষমতা অপহরণ করিয়া স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছিলেন তেমনি ইটালী, জার্মানী প্রভৃতি দেশের নগরগুলির অধিবাসিগণ রাজা বা সামন্তপ্রভুদের নিকট হইতে প্রথমে নানা সুযোগ-সুবিধা এবং ক্রমে চার্টার বা সনন্দ আদায় করিয়াছিল। কোথাও নগরের বিত্তশালী সম্প্রদায় নিজ নিজ এলাকার রাজা বা সামন্তপ্রভুকে টাকা দিয়া, কোথাও বা নগরবাসীরা দুর্বল রাজা বা সামন্তপ্রভুর নিকট হইতে জোর করিয়া নগরের স্বাধীনতা সনন্দ লাভ করিত। ইহা ছাড়া, ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হওয়ায়

অনেক রাজা ও সামন্ত প্রচুর অর্থের বিনিময়ে নিজ নিজ এলাকার নগরের স্বাধীনতার সনন্দ দিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম রিচার্ড নগরের স্বয়ত্তশাসনের সনন্দ বিক্রয় করিয়া নগরবাসীর নিকট হইতে ক্রুসেড যাত্রার অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। উত্তর ও মধ্য ইটালী, দক্ষিণ ফ্রান্স, রাইন ও ফ্লাণ্ডার্স প্রভৃতি শিল্প ও বাণিজ্য প্রধান অঞ্চলের বণিক শ্রেণীর লোকেরা প্রচুর অর্থ উপার্জন করিত। ফলে তাহারা সহজেই রাজা বা সামন্তদের নিকট হইতে বহু নগরের স্বাধীনতা আদায় করিয়াছিল। সেইজন্য ঐ সব অঞ্চলে বহু স্বাধীন নগরীর উদ্ভব হইয়াছিল।

স্বাধীনতা সনন্দের বলে স্বাধীন নগরগুলি তাহাদের নিজস্ব আইন প্রণয়ন করিত, নিজেদের মুদ্রা চালাইত, নিজস্ব ফৌজ রাখিত, কর বসাইত ও শুল্ক আদায় করিত। এই সব অধিকারের বলে কার্যত: অনেক নগর ক্ষুদ্র নগররাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছিল। এই ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল ইটালীতে ফ্লোরেন্স, জেনোয়া, মিলান প্রভৃতি এবং জার্মানীতে ল্যুবেক, হামবুর্গ প্রভৃতি স্বাধীন নগররাষ্ট্রগুলি। নগরের শাসক এক রকম স্বাধীন রাজার ন্যায় বংশানুক্রমে নগরের শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন।

মধ্যযুগে নগরগুলি সুউচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত থাকিত। এই প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত অঞ্চলটিকে 'বার্গ' বলা হইত। সনন্দপ্রাপ্ত বার্গের অধিবাসীদের জার্মানীতে 'বার্জার্স' এবং ফ্রান্সে 'বার্জেসেস' বলা হইত। এই 'বার্জেসেস' শব্দটি হইতে পরবর্তীকালের 'বুর্জোয়া' (Bourjeois) শব্দটি আসিয়াছে। বণিক, রুটি কারখানার মালিক, শহর এলাকার বড় বড় কারিগর, ব্যাঙ্কের মালিক প্রভৃতি অর্থবান ব্যক্তিদিগকে 'বুর্জোয়া' বলা হইত। মধ্যযুগের শেষভাগে 'বুর্জোয়া' বলিতে দেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে বুঝাইত। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহারা প্রচুর অর্থের মালিক হইল এবং বিভিন্ন শিল্পের পত্তন করেন। আধুনিক কালে 'বুর্জোয়া' বলিতে কায়েমী স্বার্থান্বেষী পুঁজিবাদী শ্রেণীকেই বুঝায়।

অনুশীলনী

বাস্তবভিত্তিক ও মৌখিক প্রশ্নাবলী

১। 'গিল্ড' কি? ২। 'ড্র ব্রিজ' কি? ৩। মধ্যযুগে ইউরোপে নগরের দোকানে বিক্রেয় দ্রব্যের পরিচয় হিসাবে নাপিত কি ঝুলাইয়া রাখিত? ৪। মধ্যযুগে ইউরোপে ইটালী ও জার্মাণীর একটি করিয়া স্বাধীন নগর রাষ্ট্রের নাম কর। ৫। 'বুর্জোয়া' শব্দটি কোন্ শব্দ হইতে আসিয়াছে? ৬। মধ্যযুগে ইউরোপে প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত নগরকে কি বলিত? ৭। ইংলণ্ডের কোন্ রাজা নগরের স্বায়ত্তশাসনের সনন্দ বিক্রয় করিয়া ক্রুসেড যাত্রার অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন? ৮। 'টোল' বা 'ট্যাক্স' কাহাদের দিতে হইত?

সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্নাবলী

১। খৃষ্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইউরোপের উল্লেখযোগ্য সহরগুলির নাম উল্লেখ কর।

২। মধ্যযুগে নগরগুলির নিরাপত্তার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইত?

৩। মধ্যযুগে নগরগুলির রাস্তা কিরকম ছিল?

৪। মধ্যযুগের শহরগুলিতে আলোর কিরকম ব্যবস্থা ছিল?

৫। মধ্যযুগে শহরের অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা কি ছিল?

৬। বাজারের দোকানগুলি কিভাবে তাহাদের বিক্রেয় দ্রব্যের পরিচয় দিত?

৭। নগরের ক্রীড়া-কৌতুকের নামগুলি উল্লেখ কর।

৮। মধ্যযুগের নগরজীবনের প্রধান অসুবিধা কি ছিল?

রচনাত্মক প্রশ্নাবলী

১। মধ্যযুগে ইউরোপে নগরগুলি কিভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল বর্ণনা কর। ২। মধ্যযুগে ইউরোপে নগরের উৎপত্তি ও বিকাশে ক্রুসেড ও গিল্ডের ভূমিকা আলোচনা কর। ৩। মধ্যযুগে ইউরোপে নগরজীবনের কথা বর্ণনা কর। ৪। মধ্যযুগে ইউরোপে নগরগুলি কিরূপে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

অধ্যায় ১০

মধ্যযুগে দূর প্রাচ্য : চীন ও জাপান

প্রথম পরিচ্ছেদ

চীনে তাং রাজত্ব (৬১৮খৃঃ—৯০৭খৃ:)

চীন দেশের মধ্যযুগের ইতিহাস উত্থান ও পতনের ইতিহাস।

চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ যখন ভারতবর্ষে আসেন চীনে তখন তাং বংশের রাজত্ব চলিতেছে। ৬১৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ৯০৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় তিন শত বৎসর ধরিয়া এই বংশের রাজারা রাজত্ব করেন। তাং বংশের প্রথম রাজা ছিলেন কাওৎসু। এই সময়ে চীন সাম্রাজ্য তিন ভাগে বিভক্ত ছিল এবং সাম্রাজ্যের সীমান্তস্থিত বর্বর জাতি এবং দুর্ধর্ষ তাতারদের উৎপাতে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ছিল না।

তাং বংশের দ্বিতীয় রাজা ছিলেন কাওৎসুর পুত্র তাই সুঙ্। তাং বংশের তিনিই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। তিনি ছিলেন যেমনই পরাক্রমশালী, তেমনই সুশাসক, উদারভাবাপন্ন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক। তাই সুঙ্ ৬২০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৬৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এই তেইশ বৎসর রাজত্বে তিনি যে অতুলনীয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে বলা হইত 'মিঙ্ হুয়াং' বা গৌরবময় সম্রাট।

তাই সুঙের প্রধান কীর্তি হইল তিনি দেশ হইতে তাতারদের বিতাড়িত করিয়া চীনে অখণ্ড রাষ্ট্রস্থাপন করেন। তাহা ছাড়া, দেশের সীমান্তস্থিত বর্বরদের তিনি যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাহাদের উপদ্রব হইতে দেশকে রক্ষা করেন এবং সাম্রাজ্যের সীমা বর্ধিত করেন। তুর্কী ও তিব্বতীদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধে তিনি সাফল্য লাভ করেন। পূর্ব মঙ্গোলিয়া ও দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ার খিতান জাতি তাই সুঙের বশ্যতা স্বীকার করে। এমন কি তাঁহার সময়ে কাশগড়, ইয়ারকন্দ, সমরকন্দ ও বোখরা প্রভৃতি রাজ্য চীনাবাহিনীর পদানত হইয়াছিল। তাই সুঙের রাজত্বকালে দক্ষিণে আনাম এবং পশ্চিমে কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত চীন সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। চীনের খ্যাতি এই সময়ে এতদূর

বিস্তৃত হয় যে নেপাল, মগধ, পারস্য এবং কন্স্টান্টিনোপল প্রভৃতি দেশ চীন সম্রাটের নিকট দূত প্রেরণ করেন।

তাই সুঙের রাজত্বকালে জাতীয় ঐক্য ও শান্তি বজায় ছিল। ফলে দেশে কৃষিকার্য ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা হয় এবং সাহিত্য ও শিল্পের বিকাশ ঘটে। দেশের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে তাই সুঙ্ বিশেষ আগ্রহী ছিলেন।

রাজ্যশাসনের জন্য চীনের দার্শনিক পণ্ডিত কনফুসিয়াস যে সকল নিয়ম প্রণালী প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাই সুঙ্ তাহা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া চলিতেন। অন্যায়ভাবে কেহ যাহাতে দণ্ডিত না হয় তাই সুঙ্ সেইদিকে বিশেষ নজর দেন। তিনি এইরূপ নিয়ম করিয়াছিলেন যে, কোন ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড মঞ্জুর করিবার পূর্বে সম্রাট তিনদিন উপবাসী থাকিয়া চিন্তা করিয়া দেখিবেন যেন অন্ধ আবেগে বা ভ্রমবশত কোন নির্দোষ ব্যক্তি দণ্ডিত না হয়। মন্ত্রীরা একবার সম্রাটকে দস্যুতা নিবারণের জন্য কঠোর আইন প্রবর্তন করিতে উপদেশ দিলে তিনি বলিয়াছিলেন, কঠোর শাস্তি অপেক্ষা দস্যুতা নিবারণের ভাল উপায় হইল রাষ্ট্রের ব্যয় হ্রাস, করভার লাঘব, সাধু কর্মচারী নিয়োগ, প্রজাদের খাওয়া-পরার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। এইভাবে তাই সুঙ্ তাঁহার শাসন ব্যবস্থাকে জনকল্যাণকামী করিয়া তুলিয়াছিলেন।

তাই সুঙের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র কাওৎ সুঙ্ রাজা হন। তিনি সাম্রাজ্যের পরিধি আফগানিস্থানের অক্সাস নদীর পরপারে ভারতবর্ষের সীমান্ত পর্যন্ত প্রসারিত করিয়াছিলেন। ইহার পর হইতে দুর্বল রাজাদের গৃহ বিবাদের সুযোগ লইয়া চারিদিকে বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং তাং বংশের পতন শুরু হয়। তাং বংশ একশত বৎসরকাল বেশ দৃঢ়তার সহিত রাজত্ব করেন। তাং রাজবংশের পতন শুরু হইলেও তাং বংশ আরও দুইশত বৎসর টিকিয়া ছিল।

তাং রাজাদের প্রধান কৃতিত্ব এই যে তাঁহারা চীনের খণ্ড খণ্ড রাজ্যগুলি জয় করিয়া এক ঐক্যবদ্ধ অখণ্ড রাষ্ট্র গঠন করেন। দ্বিতীয়তঃ, রাজ্যের আয়তন বা জনসংখ্যায় তাং সাম্রাজ্য ছিল সেকালের পৃথিবীতে

বৃহত্তম রাষ্ট্র। তৃতীয়তঃ, দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায়, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-শিল্প এবং কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতিতে তাং রাজত্ব বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। পরিশেষে, তাং রাজত্বকালে চীনের আইনকানুন সংকলন করিয়া লিপিবদ্ধ করা হয় এবং সেই সব আইন-কানুন যথাযথ প্রয়োগ করিয়া সাম্রজ্যের সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার চেষ্টা করা হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তাং যুগে শিক্ষা-দীক্ষা, সাহিত্য (কাব্য) —শিল্পকলা, মুদ্রণ ও চা-পান

শিক্ষা-দীক্ষা, কাব্য-সাহিত্য-শিল্পকলায় তাং যুগ ছিল চীনের স্বর্ণযুগ।

তাং যুগে শিক্ষা-দীক্ষার বিশেষ প্রসার ঘটে। তাং রাজারা দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। তাং সম্রাট তাই সুঙ্ দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারের জন্য স্থাপন করেন হান্‌লিন বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরাতন ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া চীনের ইতিহাস লেখা হইয়াছিল এবং এই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রাচীন পুঁথি শুদ্ধভাবে নকল ও সম্পাদনা করিয়া প্রকাশিত হইত। সম্রাট তাই সুঙ্ তাঁহার প্রাসাদে এক বিরাট গ্রন্থাগার গড়িয়া তুলেন এবং এই গ্রন্থাগারে হাজার হাজার দুর্মূল্য পুঁথি সংগৃহীত ছিল। এই সময়ে চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রসারের ফলে বৌদ্ধশাস্ত্র ও দর্শন পাঠে আগ্রহ দেখা যায়। তাং যুগে শিক্ষাকে বিশেষ উৎসাহ দেওয়া হইয়াছিল এবং যাহাতে সাম্রাজ্যের সর্বক্ষেত্রে মেধাবী কর্মচারী নিযুক্ত হয় সেইজন্য এখনকার মত মধ্যযুগে চীনে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইত। অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে লেখা-পড়া, পরীক্ষা দেবার আগ্রহ ছিল খুব কম। শিক্ষিত সাধারণ লোক সরকারী উচু পদে নিযুক্ত হইবার ফলে অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা তাহাদের আগেকার ক্ষমতা অনেকটা হারাইল।

কাব্য সাহিত্যের বিকাশে তাং যুগের তুলনা নাই। তাং রাজাদের

অনেকেই ছিলেন সাহিত্যানুরাগী। এই সময়ে চীনে লিপো, তুফু প্রভৃতি যশস্বী কবির আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। তবে লিপোই ছিলেন এ যুগের সবচেয়ে জনপ্রিয় কবি। তিনি অজস্র কবিতা লিখিয়াছিলেন। তাঁহার কবিতায় স্বর্গের সুধা ঝরিয়া পড়িত। তাই লোকে তাঁহাকে বলিত 'স্বর্গহারা দেবদূত'।

তাং যুগের কাব্য সংগ্রহের দশটি গ্রন্থে আটচল্লিশ হাজার কবিতা এবং তিন হাজার কবির নাম উল্লেখ আছে। তাং যুগে অনেকগুলি ছোট গল্প রচিত হইয়াছিল। এ যুগের গল্পলেখকদের মধ্যে দার্শনিক চ্যাং চি হো এবং প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ হ্যান ইউর নাম উল্লেখযোগ্য।

তাং সম্রাটদের আনুকূল্যে সাহিত্যের ন্যায় শিল্পকলায়ও এই সময়ে বিশেষ উন্নতি দেখা যায়। মূর্তিশিল্পে, চিত্রশিল্পে এবং দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিসপত্র নির্মাণে ও তাহাদের অলঙ্করণে চীনাশিল্পীরা এই সময়ে অসামান্য দক্ষতা অর্জন করে। এযুগের গড়া বুদ্ধের মূর্তিগুলি যেন প্রাণচঞ্চল, মানুষের প্রতি করুণা ও মায়ামমতায় ভরা। চীনের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর উতাওৎসে এ যুগের শিল্পী। তাঁহার চিত্ররীতির প্রভাব এখনও চীন ও জাপানের চিত্রকলায় লক্ষ্য করা যায়।

চীনামাটির শিল্প ও জেড পাথরের বিভিন্ন দ্রব্য নির্মানেও এ যুগের শিল্পীরা বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইয়াছে। হাতীর দাঁতের ও মণি-মাণিক্যের সূক্ষ্ম কাজেও এ যুগের শিল্পীরা কৃতিত্ব অর্জন করে।

তাং যুগে পৃথিবীর প্রথম ছাপাখানা চীনে স্থাপিত হয় এবং চীনারা কাগজ প্রস্তুত প্রণালীতে পারদর্শিতা লাভ করে। কথিত আছে, আরবীয়রা চীনাদের নিকট হইতে কাগজ তৈয়ারী প্রণালী শিক্ষা লাভ করে। তাং যুগে সাহিত্য রচনার বিপুল উদ্যম সম্ভব হইয়াছিল ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার কল্যাণে। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, প্রথম ছাপা বই ছিল একটি বৌদ্ধগ্রন্থ। ৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তাং শাসন কালে কাঠের ব্লক তৈরী করিয়া এই বইটি ছাপা হইয়াছিল। এই সময়ে বহু গ্রন্থ বিশেষ করিয়া রাজবংশের ইতিহাসগুলি ছাপা হইয়াছিল। প্রথমে কাঠের ব্লক দ্বারা ছাপা হইত, ক্রমে

মাটির টাইপ প্রস্তুত করা হইল এবং মোঙ্গল আক্রমণের পূর্বেই চীনে ধাতু নির্মিত টাইপ দেখা দিয়াছিল। ছাপাখানার মাধ্যমে সে যুগে দেশের শিক্ষা বিস্তার ও চীনা সংস্কৃতিকে পৃথিবীর সম্মুখে তুলিয়া ধরা সম্ভব হইয়াছিল। তাং যুগে চীনে চা-পান প্রথার প্রসার ঘটে। চীনের দক্ষিণ অঞ্চল হইতে ক্রমশ উত্তর অঞ্চলে চায়ের ব্যবহার বিস্তার হইয়াছিল। 'চা' শব্দটি চীনা। পানের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া তাং যুগে অনেক কবি কবিতা লিখেন। এই সময়ে অতিথি সম্বর্ধনায় চা পান এক বিশেষ রীতিতে পরিণত হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তাং যুগে কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্য

তাং যুগে কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ প্রসার ঘটে।

কৃষিকার্যের সুব্যবস্থার ফলে তাং যুগে দেশে প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হইত। দেশে তখন খাদ্যের অভাব ছিল না। শিল্প দ্রব্যের মধ্যে চীনে তখন কাগজ, বস্ত্র, রেশম, চীনামাটির বাসন প্রভৃতি ছিল প্রধান এই সময়ে চীনে রেশম ও পশম শিল্পের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল।

তাং যুগে চীনের সঙ্গে অন্যান্য দেশের সংযোগ বৃদ্ধি পাইবার ফলে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বিদেশে চীনা বণিক অপেক্ষা চীনে বিদেশী বণিকের সংখ্যা ছিল অনেক বেশী। রাজধানী চাং-আন (বর্তমান সিয়ান-ফু) ছিল চীনে প্রবেশ পথের প্রধান ঘাঁটি। পণ্য দ্রব্যাদির আমদানি-রপ্তানি চলিত এই শহরের মধ্য দিয়া পশ্চিমের বিবিধ জাতির মিলনক্ষেত্ররূপে এই শহরটি বিশেষ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।

জলপথেও চীনা বণিকদের জাহাজ ভারত মহাসাগরে ও পারস্য উপসাগরে দেখা যাইত পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করিতে। জলপথে চীনের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পায় যখন খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে বিশাল জাহাজযোগে পণ্যদ্রব্যাদিসহ পারস্য, আরব ও ভারতীয় ব্যবসায়ীদের চীনের বন্দরে আবির্ভাব হয়। এই সময়ে আমদানি-

রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ ও শুল্ক সংগ্রহের জন্য চীনে একটি সরকারী দপ্তর খোলা হইয়াছিল। ইসলামের অভ্যুত্থানের ফলে সমুদ্রপথে দূরপ্রাচ্যে আরবদের ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং তাহারা ক্যানটনে একটি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। রোমান সাম্রাজ্যে চীনা রেশমের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় চীন অধিক পরিমাণে রেশম বিদেশে রপ্তানি করিত। রপ্তানির অপর দুইটি প্রধান সামগ্রী ছিল মশলা ও চীনা মাটির বাসন। বিদেশ হইতে এই সময়ে চীনে আমদানি হইত তামা, ধূপ, হাতীর দাঁত, গণ্ডারের শৃঙ্গ, কচ্ছপের চাড়ি ইত্যাদি।

তাং যুগে ব্যবসা-বাণিজ্যে চীনদেশ ধনসম্পদে পূর্ণ হইয়া উঠে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চীনে বৌদ্ধধর্ম : চীনা সভ্যতার বিস্তৃতি

তাং যুগে চীন সাম্রাজ্যের সকল স্তরে বৌদ্ধধর্মের বিশেষ প্রসার ঘটে। তাং রাজারা অবশ্য ধর্মের ব্যাপারে উদার ভাবপন্ন ছিলেন। বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধি ও প্রচারকগণ রাজদরবারে সম্বর্ধনা পাইতেন। কিন্তু এই সময়ে ভারতবর্ষ হইতে বহু বৌদ্ধ পণ্ডিত ও ধর্মপ্রচারক চীনে গমন করেন এবং চীন হইতে বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু বৌদ্ধশাস্ত্রের অনুশীলন এবং বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থ সংগ্রহের জন্য ভারতবর্ষে আগমন করেন। চীনা বৌদ্ধ ভিক্ষুকের মধ্যে হিউয়েন সাঙ্ ও ই সিঙ্ ছিলেন অন্যতম। বৌদ্ধধর্মের সহজ সরল শিক্ষা চীনাদের মনে বিশেষভাবে রেখাপাত করে এবং তার ফলে অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা বৌদ্ধধর্মই চীনে অধিকতর জনপ্রিয় হইয়া উঠে।

তাং যুগে চীনে বহু বৌদ্ধমঠ স্থাপিত হয় এবং এইসব মাঠে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ নকল করা হইত এবং বৌদ্ধশাস্ত্রের চর্চা হইত।

চীনা সম্রাটগণ অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু রাজ্যশাসন ব্যাপারে কনফুসীয়গণ কর্তৃক প্রভাবিত না হইয়া তাঁহাদের গত্যন্তর ছিল না। রাজকর্মচারীরা অনেক সময়ে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের উপর অত্যাচার করিতেন। তাং যুগের দীর্ঘকালের মধ্যে দুই তিনবার বৌদ্ধধর্মের অনুষ্ঠান বন্ধ করিবার সরকারী আদেশ ও

জারি হইয়াছিল। এইসব বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও চীনের সাংস্কৃতিক মঞ্চে বৌদ্ধধর্ম যে আসন লাভ করিয়াছিল তাহার স্থায়িত্ব বা মর্যাদা কোনদিনই ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

শিক্ষা-দীক্ষায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানে, সাহিত্যে-শিল্পে, ধর্মে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, এক কথায় সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে তাং যুগে চীন এত উন্নতিলাভ করিয়াছিল যে চীনা সভ্যতা ও সংস্কৃতির গৌরবোজ্জ্বল আলোর শিখা জাপান, কোরিয়া এবং আনাম প্রভৃতি দেশকেও আলোকিত করিয়া তুলিয়াছিল। ভারতীয় সাংস্কৃতির সংস্পর্শে আসিয়া তাং যুগে চীনে গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, মুষ্টিযোগ, ভেষজবিদ্যা প্রভৃতি বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। সুশাসন ও সামরিক শক্তিতেও চীন সে সময়ে এক শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল।

কোরিয়া, আনাম প্রভৃতি দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার অঞ্চলগুলি চীনের মূল ভূখণ্ডের সহিতযুক্ত থাকিবার ফলে চীনের সভ্যতা সংস্কৃতি এইসব অঞ্চলেও বিস্তার লাভ করে। উন্নত চীনা সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিশেষ করিয়া বৌদ্ধধর্ম চীন হইতে এই সব দেশে দেশে বিস্তারলাভ করে। কোরিয়া চীনের সামরিক শক্তিকে যথাসাধ্য প্রতিরোধ কবিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু চীনা সংস্কৃতি ও সেই সঙ্গে বৌদ্ধধর্মকে সাগ্রহে বরণ করিয়া লইয়াছিল। এই কোরিয়ার মাধ্যমেই জাপানে চীনা সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রবেশ করিয়াছিল। চীন ও কোরিয়া হইতে ষষ্ঠ শতাব্দীতে জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রবেশ করে। চীনের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির নিকট চীন তখন ছিল আদর্শ স্থল এবং চীনের অনুকরণে জাপান, কোরিয়া, আনাম প্রভৃতি দেশ নিজ নিজ রাষ্ট্রগঠনে ব্যাপৃত হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ভারতে হিউয়েন সাঙের আগমন ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন এবং চীনের জনমানসে ইহার প্রভাব

হিউয়েন সাঙ ছিলেন একজন সুপ্রসিদ্ধ চীনা পরিব্রাজক। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে তিনি ভারতবর্ষে আসেন।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথম দশকে চীনের হুনান প্রদেশে এক

অভিজাত বংশে হিউয়েন সাঙ্‌ জন্মগ্রহণ করেন। তরুণ বয়সে তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া চীনের তৎকালীন রাজধানী সিয়ান-ফুর নিকটে এক মঠে বাস করিতেন। ভগবানবুদ্ধের জন্মভূমি ভারতবর্ষ দর্শন, বৌদ্ধাচার্যদের নিকট হইতে বৌদ্ধধর্ম শাস্ত্রে প্রকৃত জ্ঞান আহরণ এবং বৌদ্ধধর্ম শাস্ত্রের মৌলিক গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে বিদেশ যাত্রা সম্পর্কে সম্রাটের আদেশ উপেক্ষা করিয়া ৬২৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতবর্ষ অভিমুখে যাত্রা করেন। বিদেশ ভ্রমণের জন্য তিনি চীন সরকারের অনুমতি লাভ করেন নাই। চীনে তখন তাং রাজা তাই সুঙ্‌ রাজত্ব করিতেছিলেন।

বহু বাধা বিপত্তি কষ্ট সহ্য করিয়া সুদূর দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া হিউয়েন সাঙ্‌ ভারতবর্ষে উপস্থিত হন এবং সারা ভারতবর্ষ ঘুরিয়া, নানা সঙ্ঘারামে ও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে বৌদ্ধশাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞানার্জন করিয়া এবং বহু বৌদ্ধশাস্ত্র গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া ষোল বৎসর পর ৬৪৫ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।



হিউয়েন সাঙ্‌

হিউয়েন সাঙের প্রত্যাবর্তনের সংবাদ প্রচারিত হইলে চীনের সর্বত্র এক অভূতপূর্ব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। দেশের সমস্ত লোক তাঁহাকে অভ্যর্থনার জন্য বিরাট উৎসবের আয়োজন করে। স্বয়ং চীন সম্রাট তাই সুঙ্‌ এই সম্বর্ধনা উৎসবে যোগদান করেন। কুড়িটি সুসজ্জিত অশ্বে ভারতবর্ষ হইতে সংগৃহীত তাঁহার দ্রব্যাদি লইয়া শোভাযাত্রার ব্যবস্থা করা হয়। সম্রাট তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং তাঁহার ভ্রমণ কাহিনী লিপিবদ্ধ করিবার আদেশ দেন। ভারতবর্ষ হইতে আনীত গ্রন্থগুলির চীনা ভাষায়

অনুবাদের জন্য কয়েকজন পণ্ডিতকে নিযুক্ত করা হয়। হিউয়েন সাঙ্ জীবনের অবশিষ্ট বিশ বৎসরকাল বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যাপনা এবং বৌদ্ধশাস্ত্র গুলির অনুবাদ কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি প্রায় পঁচাত্তরখানা বৌদ্ধগ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। ভারতবর্ষে হিউয়েন সাঙ্ সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।

হিউয়েন সাঙের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর চীনাদের মনে এক নূতন প্রেরণার সঞ্চার হয় এবং সমগ্র চীনে বৌদ্ধধর্ম বিশেষভাবে বিস্তারলাভ করে। চীনের সম্রাট ভারতবর্ষ ও হর্ষবর্দ্ধন সম্পর্কে সব কিছু শুনিয়া পরের বৎসর (৬৪৬ খ্রীঃ) ওয়াং-হিউয়েন সি নামে একজন দূতকে হর্ষবর্দ্ধনের রাজসভায় পাঠান। হর্ষবর্দ্ধন অবশ্য তখন পরলোক গমন করিয়াছিলেন। হিউয়েন সাঙ্ ও তাঁহার ভ্রমণ কাহিনী চীনদেশে পৌরাণিক উপকথার উপাদানরূপে এখনও সমাদৃত। চীনের বৌদ্ধ মন্দিরে তাঁহার মূর্তি এখনও রক্ষিত আছে এবং চীনাবাসীমাত্রই এই জ্ঞানতপস্বীর নিকট শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

চীনে সুং রাজত্ব (৯৬০খৃঃ—১২৮খৃঃ)

তাং রাজত্বের অবসানে চীনে ৯০৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ৯৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অনেকগুলি বংশ রাজত্ব করে। এই সময়ে কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগে চীনে বহু স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়। দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়। ইহার পর ৯৬০ খৃষ্টাব্দে সুং বংশের রাজত্ব শুরু হয়। এই রাজবংশ তিনশত বৎসরের উপর রাজত্ব করে। এই বংশের প্রথম সম্রাট ছিলেন তাইৎসু। তাইৎসু ছিলেন একজন বড় যোদ্ধা ও শক্তিশালী সম্রাট। তিনি দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনেন এবং ঐক্য ও সংহতি পুনরুদ্ধার করেন।

সুংদের রাজত্বকালে চীনের উত্তরপ্রান্ত হইতে দুর্ধর্ষ খিতান জাতিরা বারবার চীন আক্রমণ করে। সুংরাজারা গোড়ার দিকে অর্থ দিয়া

তাহাদের সহিত সন্ধি করেন। শেষ পর্যন্ত সুং সম্রাট হিউইৎসাঙ্ (১১০১ খৃঃ—১১২৬ খৃঃ) খিতানদের চেয়ে অধিকতর বর্বর 'কিন্' অথবা 'তাতার'দের সাহায্যে খিতান আক্রমণ প্রতিরোধ করেন। কিন্ বর্বররা খিতানদের তাড়াইয়া দেয় বটে, কিন্তু তাহারা জোর করিয়া এদেশে থাকিয়া যায়। তাহারা উত্তর চীন অধিকার করিয়া পিকিংএ তাহাদের রাজধানী স্থাপন করে। কাওৎসুঙের দীর্ঘ রাজত্বকালে (১১২৭ খৃঃ—১১৬৩ খৃঃ) সুং বংশ দক্ষিণ চীনে রাজত্ব করে। শেষ পর্যন্ত ১২৮০ খৃষ্টাব্দে মোঙ্গল নেতা কবুলাই খাঁর আক্রমণে চীনে সুং বংশের পতন হয়।

সুংদের রাজত্বকালে চীনে কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি দেখা যায়। সুং যুগে চীনে বাণিজ্য রাষ্ট্রীকরণ হইয়াছিল। দেশে উৎপন্ন দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় এবং আমদানি-রপ্তানি রাষ্ট্রীয়করণের ফলে রাষ্ট্রের প্রচুর অর্থলাভ হইত এবং কৃষকরা উদ্বৃত্ত শস্য ন্যায্যমূল্যে বিক্রয় করিতে পারিত।

সুদখোর মহাজনদের হাত হইতে কৃষকদের রক্ষা করিবার জন্য সুং রাজারা অল্প সুদে কৃষকদের ঋণদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। জমি বন্ধক দিয়া কৃষকগণ ঋণ গ্রহণ করিতে এবং শস্য সংগ্রহেরপর সুদ সমেত তাহারা সে ঋণ পরিশোধ করিত। সুং যুগে ভূমি জরিপ করিয়া নূতনভাবে কর ধার্য করা হইয়াছিল। ইহা ছাড়া কোন জিনিষ বিক্রয় করিয়া শতকরা পাঁচ ভাগের বেশি লাভ করা নিষিদ্ধ করিয়া দিয়া জিনিষপত্রের দাম স্থির রাখিবার ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছিলেন।

সুংযুগে চীনে সম্পত্তি কর আদায় করা হইত। চীনের প্রচলিত করদান প্রথা অনুসারে সকল প্রদেশ হইতে ফসল রাজধানীতে প্রেরণ করিতে হইত। এই ব্যবস্থা ব্যয়বহুল ছিল এবং পরিবহনের নানা অসুবিধা দেখা দিত। ইহা ছাড়া, রাজধানীতে স্বল্পমূল্যে ঐ সঞ্চিত শস্য বিক্রয় হইত আর দূর অঞ্চলে যেখানে খাদ্যের অনটন ছিল সেখানে অত্যন্ত চড়াদামে শস্য বিক্রয় হইত। সুং সম্রাট সেন সুংএর আমলে

প্রত্যেক জেলায় রাষ্ট্রের নিজস্ব শস্যগোলা স্থাপন করা হইল এবং সেই গোলায় করলব্ধ স্থানীয় শস্য মজুত করিবার ব্যবস্থা হইল।

শিক্ষা-দীক্ষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতিতে সুংযুগ বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। এই যুগে বহু কাব্যগ্রন্থ রচিত হয়। তাং যুগে কবিরা ছিলেন 'পেশাদার' কবি, কিন্তু সুংযুগে পণ্ডিতেরা রাজকার্য ও ধর্মচর্চার অবসরে কবিতা লিখিতেন। সুং রাজত্বের প্রারম্ভে 'কুয়াং-চি' নামক একটি গল্প সংগ্রহ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বাছাই করা শ্রেষ্ঠ একখানা গল্পগুচ্ছ ছিল এই গ্রন্থ। এই যুগে বহু ইতিহাস গ্রন্থ লেখা হইয়াছিল। এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক রূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন জুমা কুয়াং। এই সময়ে মোট সতেরশ গ্রন্থের সারমর্ম লইয়া 'বিশ্বকোষ' জাতীয় একটি গ্রন্থও রচিত হয়।

কেবলমাত্র ইতিহাস, প্রবন্ধ ও কাব্য-সাহিত্যই নহে জ্যোতির্বিদ্যা, আয়ুর্বেদ, উদ্ভিদবিদ্যা ও গণিতশাস্ত্রেও নানা গ্রন্থ সুংযুগে রচিত হইয়াছিল। এই সময়কার ফলফুলের একখানি গ্রন্থে লেবু জাতীয় ফলের প্রাচীনতম বৈজ্ঞানিক বিবরণ লিখিত আছে।

সুংযুগে কথ্যভাষায় কথাসাহিত্য রচনার সূচনা হইয়াছিল। এই যুগে চিত্রশিল্প চরম উৎকর্ষ লাভ করে। প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কনই ছিল শিল্পনিষ্ঠার আদর্শ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

চীনে য়ুয়ান রাজত্ব (১২৮০খৃঃ—১৩৮০খৃঃ) : মোঙ্গলদের কথা : কুবলাই খাঁ

সুং বংশের শাসনের শেষ ভাগে বিভিন্ন বহিশত্রুর আক্রমণে চীনদেশে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। এই আক্রমণকারা ছিল মোঙ্গল জাতি। তুর্কীদের মতই মোঙ্গলরাও ছিল এক তাতার জাতি। মধ্য এশিয়ার পূর্ব প্রান্তে চীনের উত্তরে ছিল তাহাদের আদি বাসস্থান। তাহারা ছিল যাযাবর। প্রান্তরে প্রান্তরে

ঘোড়ায় চড়িয়া তাহারা ঘুরিয়া বেড়াইত এবং অন্ধকার নামিলে কোথাও তাঁবু খাটাইয়া তাহারা রাত্রিবাস করিত। তাহাদের প্রধান খাদ্য ছিল পশু মাংস ও ঘোড়ার দুধ।

মোঙ্গলরা যেমনই ছিল দুর্ধর্ষ তেমনি ছিল হিংস্র। তীর ধনুক লইয়া তাহারা যুদ্ধ করিত এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তাহাদের তীরের সম্মুখে কেহ দাঁড়াইতে পারিত না। এক একজন দলপতির নেতৃত্বে তাহারা যখন তখন চীনদেশে আসিয়া লুটপাট করিয়া চলিয়া যাইত।

ভারতবর্ষে যখন দাসবংশের সুলতানরা রাজত্ব করিতেছিলেন সেই সময়ে চেঙ্গিস খাঁ নামে এক দুর্ধর্ষ মোঙ্গল নেতার আবির্ভাব ঘটে। চেঙ্গিস যাযাবর মোঙ্গল ও মোঙ্গলদের বিভিন্ন উপজাতিসমূহকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া এক সেনাবাহিনী গঠন করেন এবং রাজ্যজয়ের পরিকল্পনা করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ায় তিনি চীনের বিরাট প্রাচীর অতিক্রম করিয়া কিন্ সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন এবং পিকিঙ জয় করেন। সেখান হইতে তিনি বিরাট মোঙ্গল বাহিনী লইয়া পশ্চিমে খোয়ারিজম রাজ্য তুর্কীস্তান আক্রমণ করেন। এই আক্রমণে বুখারা, কাশগড়, সমরকন্দ প্রভৃতি নগর ধ্বংস হয়। ইহার পর চেঙ্গিস রাশিয়া আক্রমণ করিয়া রুশদের পরাজিত করেন। দাসরাজ ইলতুৎমিসের সময়ে তিনি ভারত ভূখণ্ডেও হানা দেন। এইভাবে নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার প্রতীক চেঙ্গিস পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর হইতে পশ্চিমে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত বিশাল মোঙ্গল রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার রাজধানী ছিল মঙ্গোলিয়ার কারাকোরামে। ১২২৭ খৃষ্টাব্দে চেঙ্গিসের মৃত্যু হয়।

চেঙ্গিসের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ওগড়াই প্রবল বিক্রমে চীন আক্রমণ করিলে কিন্ বংশের পতন হয় এবং সুং বংশের সহিত সন্ধি হয়।

১২৫৯ খৃষ্টাব্দে চেঙ্গিসের পৌত্র হুলাগুর ভ্রাতা কুবলাই খাঁ (১২১৬ খৃঃ—১২৯৪ খৃঃ) মোঙ্গল সাম্রাজ্যের অধিপতি হন। ১২৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি সমগ্র চীন জয় করিলে সুং বংশের পতন হয় এবং তিনি চীনে য়ুয়ান বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মার্কোপোলোর বিবরণ

মার্কোপোলো ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ ভেনিসীয় পর্যটক। ১২৯৮ খৃষ্টাব্দে ইটালীর অন্তর্গত জেনোয়ার সহিত যুদ্ধে ভেনিস পরাজিত হইলে মার্কোপোলো বন্দী হন। তিনি ইহার পূর্বেই বহু দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। কারাগারে তিনি এই সব ভ্রমণ কাহিনী বলিতেন এবং একজন কারাসঙ্গী সেইগুলি লিপিবদ্ধ করেন। এই বিবরণ হইতে মোঙ্গলদের এবং তখনকার চীনের নানা তথ্য পাওয়া যায়। একবার পিতা ও পিতৃব্যের সহিত মার্কোপোলো চীনে কুবলাই খাঁর দরবারে উপস্থিত হন। ইউরোপ হইতে প্যালেস্টাইন, আর্মেনিয়া ও মেসোপটেমিয়া হইয়া তাঁহারা পারস্য উপসাগরের হোর্মুজ বন্দরে উপস্থিত হন। তারপর পারস্যের ভিতর দিয়া বাল্খে এবং বাল্খে হইতে পামির অতিক্রম করিয়া কাশগড় ও খোটান হইয়া হোয়াং হো নদী ধরিয়া তাঁহারা অবশেষে পৌছেন পিকিঙে কুবলাই খাঁর দরবারে। চীনে পৌছিতে তাঁহাদের চারি বৎসর সময় লাগিয়াছিল। কুবলাই খাঁ তাঁহাদের সাদরে অভ্যর্থনা করেন। মার্কোপোলো অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন। এবং শীঘ্রই তিনি কুবলাইএর প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। কুবলাই তাঁহাকে কয়েকটি সরকারী কার্যে নিযুক্ত করেন এবং কয়েকটি দেশে দূতরূপে প্রেরণ করেন। মার্কোপোলো চীনের হ্যাংচাউ নগরের শাসনকর্তাও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। দীর্ঘ দিন চীনে অতিবাহিত করিয়া এবং দূত হিসাবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান ঘুরিয়া শেষ পর্যন্ত জলপথে



মার্কোপোলো

কুবলাই খাঁর চীনা নাম ছিল সিস্থু। কুবলাই খাঁ তাঁহার পূর্বপুরুষদের মত দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ছিলেন। তাঁহার সময়ে মোঙ্গল সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ বিস্তৃতি দেখা যায়। তিনি জাপান ও কোরিয়া রাজ্য জয় করিবার চেষ্টা করেন। ব্রহ্মদেশ, আনাম প্রভৃতি দেশও তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ইউরোপ ও



কুবলাই খাঁ

এশিয়ার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে তাঁহার সাম্রাজ্য প্রসারিত হয়। তাঁহার সময় হইতে চীন মোঙ্গল সাম্রাজ্যের প্রধান কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়। কুবলাই তাঁহার রাজধানী কারাকোরাম হইতে পিকিঙে স্থানান্তরিত করেন। ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে কুবলাইর মৃত্যু হয়।

কুবলাই খাঁর শাসনকালকে 'মোঙ্গল শাসনের স্বর্ণযুগ' বলা হয়। তাঁহার সময়ে এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে মোঙ্গলদের বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কুবলাই খাঁর দরবারে বিভিন্ন দেশের জ্ঞানী-গুণী, শিল্পী, বণিক ও ধর্মপ্রচারকের সমাবেশ ছিল। তাঁহার রাজত্বকালে মার্কোপোলো চীন পরিদর্শন করেন।

কুবলাই খাঁর মৃত্যুর পর বিশাল মোঙ্গল সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। শেষ পর্যন্ত ১৩৬৮ খৃষ্টাব্দে য়ুয়ান বংশের পতন হয়। ইহার কিছুদিন পরে আবার খাঁটি চীনা মিং বংশের রাজত্ব আরম্ভ হয়।

যবদ্বীপ, সুমাত্রা, দক্ষিণ ভারত, পারস্য, কনস্টান্টিনোপল হইয়া দীর্ঘ তেইশ বৎসর পর মার্কোপোলো স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

মার্কোপোলোর বিবরণ হইতে জানা যায় যে, তখন চীনের পিকিঙ শহরের ঐশ্বর্য ও সম্পদের অভাব ছিল না। পিকিঙের বাজারে দেশ-বিদেশের পণ্য আসিত। শহরে ছিল ভাল ভাল হোটেল ও স্নানাগার। মনোহর, উদ্যান, হ্রদ ও বড় বড় অট্টালিকা শহরের শোভাবর্ধন করিত। শহরের কেন্দ্রস্থলে ছিল কুবলাই খাঁর প্রাসাদ। প্রাসাদের সর্বত্র ছিল স্বর্ণ ও রৌপ্য মণ্ডিত অপূর্ব কারুকার্য। সম্রাটের দরবারে ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরের অভাব ছিল না। কুবলাই খাঁ সম্বন্ধে মার্কোপোলো বলেন যে, তিনি পরধর্মসহিষ্ণু ছিলেন। জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের তিনি সমাদর



করিতেন। বিদেশীদের প্রতি তিনি সহানুভূতিশীল ছিলেন। এক হাজার মাইল দীর্ঘ এক মজাখালের তিনি সংস্কার করেন। ডাক চলাচলের সুবিধার জন্য তিনি কয়েকটি রাজপথ নির্মাণ করেন। গরীব দুঃখীকে তিনি অকাতরে দান করিতেন।

চীন প্রসঙ্গে মার্কোপোলো বলেন যে, সে সময়ে বিশাল চীনদেশ

ছিল শস্য সম্পদে পূর্ণ। দেশ জুড়িয়া ছিল অসংখ্য সমৃদ্ধ নগর ও গ্রাম। পথিকদের সুবিধার জন্য পথের ধারে ধারে ছিল সরাইখানা। দেশের চারিদিকে ছিল আঙ্গুরের ক্ষেত, বাগান, উপবন আর মধ্যে মধ্যে বৌদ্ধ মঠ। স্থলপথে ও জলপথে দেশের বাণিজ্য চলিত।

মার্কোপোলো হ্যাংচাউ নগর সম্বন্ধে বলেন যে, হ্যংচাউ নগরের রাস্তাগুলি ছিল প্রশস্ত ও বাঁধানো। নগরের অভ্যন্তরে বহু চওড়া খাল ছিল। খালের উপর যাতায়াতের সুবিধার জন্য বহু সেতু ছিল। নগরে মনোরম স্নানাগারও ছিল। নগরের বাজারটি ছিল বেশ বড়। বাজারে ভারতীয় বণিকদের বেশ পসার ছিল। রেশম ও সোনার জরির কাপড় এখানকার বিশেষ আকর্ষণ ছিল।

মার্কোপোলো তাঁহার ভ্রমণ কাহিনীতে ব্রহ্মদেশ, জাপান এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানা কথা লিখিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মদেশে তিনি এক বিশাল হস্তিবাহিনী দেখিয়াছিলেন। জাপানে ছিল সোনার ছড়াছড়ি। জাপানের রাজা সোনার প্রাসাদে বাস করিতেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মার্কোপোলো বলেন, সে সময়ে দাক্ষিণাত্যে রাজত্ব করিতেন কাকতীয় বংশের রুদ্রাম্বা নামে এক শক্তিমতী রাণী। মার্কোপোলো রাণীর ভূয়সী প্রশংসা করেন। মার্কোপোলো ভারতীয় যোগীদের অলৌকিক ক্ষমতার কথা বর্ণনা করেন।

নবম পরিচ্ছেদ

মধ্যযুগের গোড়ার দিকে জাপান সমাজ ও সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি

'উদীয়মান সূর্যের দেশ' জাপান এশিয়া ভূখণ্ডের পূর্বে প্রশান্ত-মহাসাগরে অবস্থিত কয়েকটি দ্বীপের সমষ্টি।

জাপানের ইতিহাস খুব প্রাচীন। খৃষ্টীয় নবম শতক হইতে উনবিংশ শতক পর্যন্ত জাপানের ইতিহাস 'ফুজিওয়ারা,' 'তাইরা,' 'মিনামোতো' এবং 'তোকুগাওয়া' নামক চারিটি সামন্ত বা জমিদার বংশের ইতিহাস। জাপানে তখন বড় বড় জমিদাররাই ছিলেন দেশের

সর্বেসর্বা, দেশের ধনসম্পদের প্রকৃত মালিক। এই সব জমিদারদের জাপানে 'দাইমিও' বলা হইত।

(মধ্যযুগে গোড়ার দিকে জাপানের সমাজ ছিল মধ্যযুগের ইউরোপীয় সমাজের ন্যায় সামন্ততান্ত্রিক। সামাজিক মর্যাদার সর্বোচ্চে ছিলেন রাজা ও রাজকীয় পরিবার, দাইমিওগণ এবং দরবারের অভিজাতগণ বা 'কুজি'গণ। পরবর্তীকালে সোগান পদ সৃষ্টি হইলে সোগানরা প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হন এবং এই সময়ে জাপানে সামরিক সামন্ততান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা হয়।)

সোগান এবং সোগান পরিবারের লোকজন দেশের মোট কৃষি জমির এক চতুর্থাংশের মালিক ছিলেন এবং তাঁহাদের আয়ের প্রধান উৎসই ছিল এই জমি। দেশের বাকী প্রায় তিন চতুর্থাংশ কৃষিজমি দাইমোদের কর্তৃত্বাধানে ছিল। দাইমোরা নিজ এলাকায় স্বাধীনভাবে কর্তৃত্ব করিতেন। প্রত্যেক দাইমোকে অবশ্য সোগানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিতে হইত। সম্রাটের ভরণপোষণের অর্থ সোগানরাই নির্ধারণ করিয়া দিতেন।

মর্যাদার দিক হইতে সমাজের দ্বিতীয় স্তরে ছিলেন একদল শক্তিশালী সম্ভ্রান্ত সামরিক সম্প্রদায়। জাপানে এই সামরিক ব্যক্তিগণ 'সামুরাই' নামে পরিচিত ছিলেন।

(সমাজের তৃতীয় স্তরে ছিল সাধারণ মানুষ—কৃষক, শিল্পী ও ব্যবসায়ী। জাপানে তখন কৃষকের সংখ্যাই ছিল বেশী। ইউরোপে সাফ বা ভূমিদাসদের ন্যায় এই সব কৃষকদের স্বাধীনতা বলিতে কিছু ছিল না। দাইমিওদের জমি চাষ করা এবং তাঁহাদের সেবা করাই ছিল তাহাদের প্রধান কাজ। জমি ছাড়িয়া তাহারা কোথাও যাইতে পারিত না তাহাদের পোষাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান, শস্য উৎপাদন সবই দাইমোদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইত।) নানারকম কর দিয়া এবং দাইমোদের সেবার জন্য বেগার দিয়া অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে কৃষকদের কালাতিপাত করিতে হইত।

মধ্যযুগে জাপানের সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অর্থনীতিও সোগান, দাইমিও এবং সামুরাইরা নিয়ন্ত্রণ করিতেন। জাপানের সামন্তপ্রথা কতকটা ইউরোপের সামন্তপ্রথার ন্যায়ই গড়িয়া উঠিয়া ছিল।

দশম পরিচ্ছেদ

জাপানী সম্রাট মিকাডোর সর্বাধিনায়কত্ব : চীনের সহিত জাপানের সম্পর্ক

জাপানের সম্রাটকে 'মিকাডো' (Mikado) বলা হয়। জাপানীরা মনে করে যে তাহাদের সম্রাট বংশ সূর্যদেব হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। উত্তরাধিকার সূত্রে সেই বংশেরই কেহ না কেহ আজ পর্যন্ত সম্রাট পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

জাপানীরা চিরকাল সম্রাটকে দেবতার মত ভক্তি করে। দেশের শাসন-ব্যবস্থার সর্বোচ্চে ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন দেশের প্রধান শাসনকর্তা ও প্রধান পুরোহিত। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দী হইতে সোগান ও সামুরাইদের শক্তি প্রবল হইয়া উঠিলে জাপানী সম্রাট মিকাডোর সর্বময় ক্ষমতা লুপ্ত হয়। তখন হইতে তিনি দেশ শাসন না করিয়া কেবলমাত্র রাজত্ব করিতেন। সকলেই এক রাজার অধীন এই ধারণাটুকুই জাপানী সমাজের ছিল একমাত্র যোগসূত্র। তিনি লোকচক্ষুর অগোচরে গোপনে কিয়োটো শহরে রাজকীয় অভিজাতগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া বসবাস করিতেন। শাসনকার্যে তিনি কোনরূপ অংশ গ্রহণ করিতেন না, সোগান ও সামুরাইদের উপর দেশের শাসনভার ন্যস্ত ছিল।

বহু প্রাচীন কাল হইতেই চীনের সহিত জাপানের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভেই কোরিয়ার মারফতে জাপানে চীন-সভ্যতা আমদানী হইয়াছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে কোরিয়ার মাধ্যমে চীনের লিখিত ভাষাও জাপানে পৌঁছায়। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে চীন ও কোরিয়া হইতে বৌদ্ধধর্ম জাপানে প্রবেশ করে। ইহার ফলে বহু জাপানী বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে ওয়ানী নামে জনৈক কোরিয় পণ্ডিত জাপানী অভিজাতদের মধ্যে কনফুসীয় গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে চীনদেশীয় শিক্ষার প্রবর্তন করেন। এইভাবে চীনা সংস্কৃতি জাপানে প্রসারলাভ করে।

খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতকে আশিকাগা সোগান বংশের শাসনকালে চীনের নিকট হইতে চিত্রাঙ্কন, কাব্য, গৃহনির্মাণ, দর্শনবিদ্যা প্রভৃতি জাপানীরা শিক্ষালাভ করে।

এইভাবে মধ্যযুগে জাপানী শিক্ষা-দীক্ষায়, সাহিত্য-শিল্পে, স্থাপত্য-ভাস্কর্য, রীতি-নীতি ও ধর্মে চীনা প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

একাদশ পরিচ্ছেদ

মধ্যযুগে জাপানে আভ্যন্তরীণ কলহ : বৃহৎ অভিজাত পরিবারদের প্রতিরোধ

মধ্যযুগে জাপানে ক্ষমতালাভের উদ্দেশ্যে আভ্যন্তরীণ কলহ প্রায় লাগিয়াই থাকিত। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকে তোকুগাওয়া সোগান যুগে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হইলেও তোকুগাওয়াদের শত্রুর অভাব ছিল না। ইহাদের প্রধান শত্রু ছিলেন সৎসুমা, চোস্থ, তোসা ও হিজেন বংশীয় 'তোজামা' বা পশ্চিমী জমিদারগণ। দেশের মঙ্গল করা অপেক্ষা সোগানের আধিপত্য খর্ব করাই ছিল তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য।

উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বেই দেশের ভাবমূর্তি লক্ষ্য করিয়া এবং নিজেদের দুর্বলতা উপলব্ধি করিয়া তোকুগাওয়া বংশের সোগান শত্রুদের প্রতিরোধ করিবার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করেন। প্রথমে সামুরাই-দের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের জন্য তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ইহার ফলে চীনদেশীয় প্রভাবে গঠিত প্রাচীন জাপানী শিক্ষা ও সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, সোগান শত্রুদের ঠেকাইবার জন্য সম্রাটের ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করিতে সচেষ্ট হন। তৃতীয়তঃ, জাপানের প্রাচীন শিন্টোধর্ম (Shintoism) পুনঃ প্রবর্তিত হয়। শিন্টোধর্ম পুনরুজ্জীবনের ফলে দেশের জনগণ জানিতে পারে যে, সম্রাটই তাঁহাদের ধর্মীয় প্রধান। ফলে জাপানী সম্রাট মিকাডোর সম্মান অভাবনীয়রূপে বৃদ্ধি পায়। তাহা ছাড়া দেশের প্রতি মমত্ববোধ এবং পূর্বপুরুষদের পূজা করাও এই ধর্মের বৈশিষ্ট্য ছিল এই সবই 'তাঁহারা দেবতাদের পথ'

(ways of gods) বলিয়া মনে করিত। দেশের প্রাচীন ইতিহাস পঠন-পাঠনে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় জানিতে পারে যে পূর্বে যে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি সম্রাট ভোগ করিতেন তাহা সোগানরা অপহরণ করিয়াছে। স্বভাবতঃই সোগানের বিরুদ্ধে জাপানের জনমত দানা বাঁধিয়া উঠে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

প্রধান পুরোহিত ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী শাসকরূপে সম্রাটের ক্ষমতা গ্রহণ কেন্দ্রীয় শক্তির ক্রমিক দুর্বলতা

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পৃথিবীর দিকে দিকে জাপানের বন্ধ দরজা উন্মুক্ত হইল। জাপানীরা তখন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছুটিয়া গিয়া তাহাদের শিল্প, সভ্যতা, সংস্কৃতি, শাসনরীতি ও সামরিক বিদ্যা শিক্ষা করিয়া ক্ষিপ্রগতিতে উন্নত হইয়া উঠিল। পশ্চিমীদেশের সংস্পর্শে আসিয়া জাপানে জাতীয়তার আবির্ভাব হইল। প্রাচীন ধর্ম ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে সম্রাটের জনপ্রিয়তা ইতিমধ্যে বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা এই সময়ে ভীষণ আকার ধারণ করে। ফলে সোগান জনসাধারণের অপ্রিয়ভাজন হন এবং তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হয়। সংসুমা, চোসু, তোসা ও হিজেন বংশীয় নেতৃবর্গ ঐক্যবদ্ধ হইয়া সোগানের পতন ঘটাইবার চেষ্টা করে। এই সময়ে বিদেশী শক্তিবর্গের বিরোধী সম্রাটের মৃত্যু হয়। নূতন সম্রাট মুৎসিহিতো ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে 'মেইজী' উপাধি গ্রহণ করিয়া জাপানের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং সোগান তাঁহার ক্ষমতা ত্যাগ করেন। ইহার পর জাপানের সম্রাট শিন্টোধর্মের প্রধান পুরোহিত এবং দেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শাসকরূপে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন।

জাপানী সম্রাট পূর্ণ ক্ষমতায় আসীন হইলেও কেন্দ্রীয় শক্তি সুসংহত হইতে পারে নাই। সম্রাটকে প্রতীক স্বরূপ রাখিয়া উত্তরাধিকার সূত্রে সংসুমা, চোসু, তোসা ও হিজেন বংশীয় অভিজাত পরিবার দেশে আধিপত্য চালাইত। রাজনীতি ও অর্থনীতিতেও তাহারা বিশেষ

প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই সময়ে জাপানে বৌদ্ধসঙ্ঘের বিকাশ ঘটে এবং এইসব সঙ্ঘের কার্যকলাপ কেন্দ্রীয়শক্তির সুসংহতির পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মধ্যযুগে জাপানে সোগানতন্ত্র, সামুরাই ও বুশিদো

সোগান তন্ত্র: মধ্যযুগে জাপানে প্রধান সেনাপতিকে 'সোগান' বলা হইত। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে মিনামোতো বংশের যোরিতোমো নামে এক ক্ষমতাশালী ব্যক্তি প্রথম 'সোগান' উপাধিতে ভূষিত হন। ইহার পর হইতে এই 'সোগান' উপাধি উত্তরাধিকার সুত্রে দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিতে থাকে এবং এই 'সোগান'ই হন জাপানের প্রকৃত শাসনকর্তা। সোগান কথার অর্থ হইল 'প্রধান সেনাপতি'। প্রায় সাতশত বৎসর ধরিয়া বিভিন্ন অভিজাত বংশের সোগানরা দেশশাসন করেন। ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে আশিকাগা নামে এক নূতন সোগান বংশের শাসনকাল আরম্ভ হয়। ইহার পর ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে তোকুগাওয়া ইযেযাশু সোগান পদ লাভ করেন এবং দুইশত চৌষট্টি বৎসর তোকুগাওয়া বংশের সোগানরাই দেশ শাসন করেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে জপানের সম্রাট প্রকৃত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলে সোগানদের আধিপত্যের বিলোপ ঘটে।


সামুরাই

সামুরাই: জাপানের দাইমোরা সামুরাই নামে এক বিশেষ ধরনের সৈন্য রাখিতেন। তাহারা ছিল জাপানের সামন্ত জমিদার, অভিজাত গোষ্ঠির নিজ নিজ দেহরক্ষী অর্থাৎ সৈনিকের দল। এই সামুরাইরা ছিল যেমন সাহসী

তেমনি বীরযোদ্ধা। একটা তলোয়ারে তাহাদের কুলাইত না, কোমরের দুইপাশে দুইটি তলোয়ার ঝুলাইয়া তাহারা ঘুরিয়া বেড়াইত। সামুরাইদের একটা বড় গুণ ছিল যে, নিজের বা দেশের সম্মান রক্ষার জন্য তাহারা মৃত্যুকেও বরণ করিতে কুণ্ঠিত হইত না।

মধ্যযুগের গোড়ার দিকে জাপানে সামুরাইরা প্রভূত ক্ষমতা অর্জন করিয়া দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এই বংশানুক্রমিক সামরিক সম্প্রদায় দাইমোদের দেওয়া জমি বা শস্যেয় জীবনধারণ করিত। তোকুগাওয়া যুগে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হইলে সামুরাইদের প্রভাব একেবারে হ্রাস পায়। সামুরাই মাত্রেই কোন না কোন অভিজাত ব্যক্তি অর্থাৎ সামন্তের ও সোগানের আনুগত্য স্বীকার করিত।

বুশিদো : জাপানে সামুরাইদের আদর্শ, গুণাবলী ও আচরিত নীতিসমূহকে 'বুশিদো' বলা হয়। 'বুশিদো' মধ্যযুগের ইউরোপীয় শিভালরীর আদর্শের অনুরূপ ছিল। 'বুশিদো'র আদর্শ ছিল সামরিক নৈপুণ্য, ক্রীড়া দক্ষতা, যুদ্ধক্ষেত্রে নির্ভীকতা, মিতব্যয়ী জীবন, দয়া, শুদ্ধচিত্ততা ও নিজ প্রভুকে আমৃত্যু সেবা করা। প্রভুর জন্য জীবন, তার পরিবার পরিজন' এমনকি তার ধর্মাধর্ম সব কিছু দান করিতে প্রস্তুত থাকা ছিল বুশিদোর নীতি। সামুরাই-র স্ত্রীকে সম্পূর্ণ আত্মত্যাগী হইতে হইত, দুঃখ-কষ্ট, শোক কোন কিছু যাহাতে তাহাকে বিচলিত না করিতে পারে সেই শিক্ষা স্ত্রীকে দেওয়া হইত। বুশিদোর নীতি সামুরাইদের মধ্যে কঠোর শৃঙ্খলাবোধ, আত্ম-প্রত্যয় ও আত্ম নির্ভরশীলতা জাগাইয়া তুলিয়াছিল।

জাপানে জাতীয়তাবাদ বিকাশে এবং জাপানের জনগণের মনোবল গঠনে 'বুশিদো'র প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

৬। মধ্যযুগে জাপানে কৃষকদের অবস্থা কিরূপ ছিল ?

৭। মার্কোপোলো হ্যাংচাউ নগরের কিরূপ বিবরণ দিয়াছেন ?

৮। খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বেই সোগানরা শত্রুদের প্রতিরোধ করিবার জন্য কি কি উপায় উদ্ভাবন করেন ?

রচনাত্মক প্রশ্নাবলী

১। চীনের তাং রাজাদের কৃতিত্বগুলি উল্লেখ কর।

২। বিজেতা ও সুশাসক হিসাবে তাইসুঙের কৃতিত্ব বর্ণনা কর।

৩। শিক্ষা, দীক্ষা, কাব্যসাহিত্য ও শিল্পকলায় তাং যুগকে চীনের 'স্বর্ণযুগ' বলা হয় কেন ?

৪। তাং যুগে চীনের কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা বর্ণনা কর।

৫। তাং যুগে চনে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ও চীনা সভ্যতার বিস্তৃতি কিভাবে হইল বর্ণনা কর।

৬। হিউয়েন সাঙ্ কে ছিলেন ? তিনি কি উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে আগমন করেন ? তাঁহার স্বদেশে প্রত্যাবর্তন চীনের জনমানসে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৭। চীনে সুং রাজত্বের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখ।

৮। মোঙ্গলদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া চেঙ্গিস খাঁর কৃতিত্ব বর্ণনা কর।

৯। কুবলাই খাঁ কে ছিলেন ? তাঁহার শাসনকালকে 'মোঙ্গল শাসনের স্বর্ণযুগ' বলা হয় কেন ?

১০। চীনে য়ুয়ান রাজত্বের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখ।

১১। মার্কোপোলো কে ছিলেন ? তিনি কোন্ পথে ভারতে আসেন ? তাঁহার বিবরণী হইতে কুবলাই খাঁ, চীন ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যাহা জানা যায় বর্ণনা কর।

১২। মধ্যযুগের গোড়ার দিকে জাপানের সমাজ ও সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

অনুশীলনী

বাস্তবভিত্তিক ও মৌখিক প্রশ্নাবলী

১। চীনে তাং বংশের প্রথম রাজা কে ছিলেন ?

২। চীনে তাং যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর কে ছিলেন ?

৩। হিউয়েন সাঙ্ কত খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন ?

৪। সম্রাট হিউইৎ সাঙ্ কাহাদের সাহায্যে চীনে খিতান আক্রমণ প্রতিরোধ করেন ?

৫। চেঙ্গিস খাঁর রাজধানী কোথায় ছিল ?

৬। কুবলাই খাঁর চীনা নাম কি ছিল ?

৭। কুবলাই খাঁ রাজধানী কোথায় স্থানান্তরিত করেন ?

৮। 'মিউ হুয়াং' নামে কে খ্যাতিলাভ করেন ?

৯। চীনে তাং বংশের সর্বশ্রেষ্ঠনরপতি কে ছিলেন ?

১০। কাহাকে 'স্বর্গহারা দেবদূত' বলা হইত ?

১১। তাং যুগে চীনের এক সুপ্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞের নাম উল্লেখ কর।

১২। কোন্ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের সম্রাট প্রকৃত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন ?

১৩। জাপানের নিজস্ব প্রাচীন ধর্ম কোন্‌টি ?

১৪। দিল্লীর কোন্ সুলতানের রাজত্বকালে চেঙ্গিস্ খাঁ ভারত ভূখণ্ডে হানা দেন ?

১৫। কার আক্রমণে চীনে সুং বংশের পতন হয় ?

১৬। মার্কোপোলো দাক্ষিণাত্যের কোন্ রাণীর ভূয়সী প্রশংসা করেন ?

১৭। কোন্ দেশকে 'উদীয়মান সূর্যের দেশ' বলা হয় ?

১৮। কত খ্রীষ্টাব্দে চীনে য়ুয়ান বংশের পতন হয় ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী

১। মধ্যযুগে চীন ও জাপানের সম্পর্ক সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

২। মধ্যযুগে জাপানের আভ্যন্তরিণ কলহে বৃহৎ অভিজাত পরিবারদের ভূমিকা কি ছিল বর্ণনা কর।

৩। সোগানতন্ত্র, সামুরাইগণ ও বুশিদো সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৪। অন্যায়ভাবে কেহ যাহাতে দণ্ডিত না হয় সেজন্য তাইসুঙ্গ কি নিয়ম করিয়াছিলেন ?

৫। রাজ্যে দস্যুতা নিবারণের উপায় হিসাবে তাইসুঙ্গ কি বলিয়াছিলেন ?

অধ্যায় ১১

মধ্যযুগে ভারত

প্রথম পরিচ্ছেদ

গুপ্তোত্তর যুগ (খৃষ্টীয় পঞ্চম হইতে সপ্তম শতাব্দী) : ভারতে হূণ অভিযান

গুপ্ত রাজারা ভারতবর্ষে প্রায় তিনশত বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহারা উত্তর ভারতে রাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থাপন করেন। তাঁহাদের রাজত্বে দীর্ঘদিন ধরিয়া সাম্রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় ছিল। ফলে এই সময়ে নানা দিক দিয়া দেশ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে গৌরবের উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিল। কিন্তু শেষ গুপ্ত রাজারা ছিলেন দুর্বল প্রকৃতির এবং আত্মকলহে ব্যস্ত। এই সুযোগে শ্বেত হূণ নামে এক বর্বর জাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করে।

মধ্য এশিয়া হইতে হূণগণ দুইদলে বাহির হইয়াছিল। একদল চলিয়া যায় ইউরোপের দিকে, আর একদল অগ্রসর হয় ভারতবর্ষের দিকে। শেষোক্ত দলটি শ্বেত হূণ নামে পরিচিত। এটিলা ও তাঁহার দুর্ধর্ষ বাহিনী যখন ইউরোপে বিভীষিকার সৃষ্টি করিতেছিলেন তাহারই কিছু পরে ৪৫৮ খৃষ্টাব্দে শ্বেত হূণরা হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করিয়া উত্তর-পশ্চিম ভারত আক্রমণ করে। ইহারা গান্ধার অধিকার করিয়া লয় এবং গুপ্ত সাম্রাজ্যে হানা দিতে থাকে। গুপ্তরাজ স্কন্দগুপ্ত দুর্ধর্ষ হূণবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়া তাহাদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। ইহার পর পঞ্চাশ বৎসর কাল হূণেরা গুপ্ত সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইতে সাহস পায় নাই। এইজন্য ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্কন্দগুপ্তের নাম স্মরণীয় হইয়া আছে।

হূণেরা ইহার পর খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের শেষভাগে কাবুল ও পারস্য জয় করিয়া মধ্য এশিয়ার একাংশ ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের কিয়দংশ লইয়া এক বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য স্থাপন করে।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের প্রারম্ভে হূণরা পুনরায় তোরমানের নেতৃত্বে

কাশ্মীর, পাঞ্জাব, রাজপুতানা, উত্তর প্রদেশের কিয়দংশ ও মালব জয় করে।

তোরমানের পর তাঁহার পুত্র মিহিরগুল হূণ সিংহাসনে আরোহণ করেন আনুমানিক ৫১৫ খৃষ্টাব্দে)। মিহিরগুল ছিলেন বিশেষ শক্তিশালী কিন্তু অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির শাসক। তাঁহার রাজধানী ছিল পাঞ্জাবের শাকলে (বর্তমান শিয়ালকোটে)। তাঁহার অত্যাচারে ভারতবাসীরা অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। কাশ্মীরের ঐতিহাসিক কহ্লন এবং চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ মিহিরগুলের অত্যাচারের বহু কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন, কত নরনারী তিনি হত্যা করিয়াছেন, কত মঠ মন্দির ধ্বংস করিয়াছেন কত জনপদ ছারখার করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। কথিত আছে যে, পাহাড়ের চূড়া হইতে হাতীগুলিকে নীচে গড়াইয়া দিয়া তিনি মজা দেখিতেন।

এই সময়ে মালবের অন্তর্গত দশপুরের (মন্দাসোর) রাজা যশোধর্মন মিহিরগুলকে পরাজিত করিয়া হূণ পরাক্রম খর্ব করেন। যশোধর্মনের মৃত্যুর পর মিহিরগুল পুনরায় শক্তিশালী হইয়া উঠিলে গুপ্তরাজ নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে মিহিরগুলকে আক্রমণ করেন এবং যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া ভারতে হূণশক্তি ধ্বংস করেন। কথিত আছে যে, বালাদিত্য তাঁহার মাতার আদেশে মিহিরগুলকে মুক্তি দেন।

যে সব হূণ ভারতবর্ষে বসবাস করিতেছিল তাহারা ভারতীয় ধর্ম ও রীতিনীতি গ্রহণ করিয়া ভারতীয়দের সহিত মিশিয়া গেল। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

'হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন—
শক হূণদল, পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।'

জৈনগ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, তোরমান শেষ জীবনে জৈনধর্ম গ্রহণ করেন। মনে হয় মিহিরগুল শৈবধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার মুদ্রায় শিবের বাহন বৃষের মূর্তি অঙ্কিত দেখা যায়। হূণরা ক্রমে ভারতীয়দের

সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে। অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে মধ্য ভারতের বীর্যবান রাজপুত জাতি হূণ জাতিরই বংশধর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

খণ্ডবিখণ্ড গুপ্তসাম্রাজ্য : হর্ষবর্ধনের যুগ

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের শেষভাগে গুপ্তরাজাদের দুর্বলতার সুযোগে একদিকে দুর্ধর্ষ হূণদের ক্রমাগত আক্রমণে গুপ্তসাম্রাজ্য হীনবল হইয়া পড়ে, অপরদিকে সাম্রাজ্যের চারিদিকে বিদ্রোহ দেখা দেয়। ফলে অল্পকালের মধ্যেই গুপ্তসাম্রাজ্যের গৌরব-রবি অস্তমিত হয় এবং বিশাল গুপ্তসাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়াযায়। গুপ্ত-গরিমার সমাধির উপর আর্যাবর্তে কতকগুলি ছোট ছোট খণ্ডরাজ্য মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়। উত্তর-পশ্চিম ভারতে গান্ধার হইতে পাঞ্জাব পর্যন্ত ভূভাগে একটি শক্তিশালী হূণরাজ্য স্থাপিত হয়। হূণরাজ্যের দক্ষিণে ছিল মৈত্রক বংশের বলভী রাজ্য। রাজপুতানায় হূণজাতির গুর্জর শাখা একটি পৃথক রাষ্ট্র স্থাপন করে। উত্তর ভারতের অন্যান্য স্বাধীন রাষ্ট্রের মধ্যে ছিল পুষ্যভূতি বংশের থানেশ্বর, মৌখরি বংশের কনৌজ, উত্তরকালীন গুপ্তবংশের মগধ ও মালব রাজ্য, দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের রাজ্য দুইটি, নেপাল, কামরূপ ও উড়িষ্যা। মালবের অন্তর্গত দশপুরের যশোধর্মনও একটি শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।



হর্ষবর্ধন

গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের প্রায় একশত বৎসর পরে ভারতের বুকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে একত্র করিয়া আর্যাবর্তে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলেন রাজা হর্ষবর্ধন।

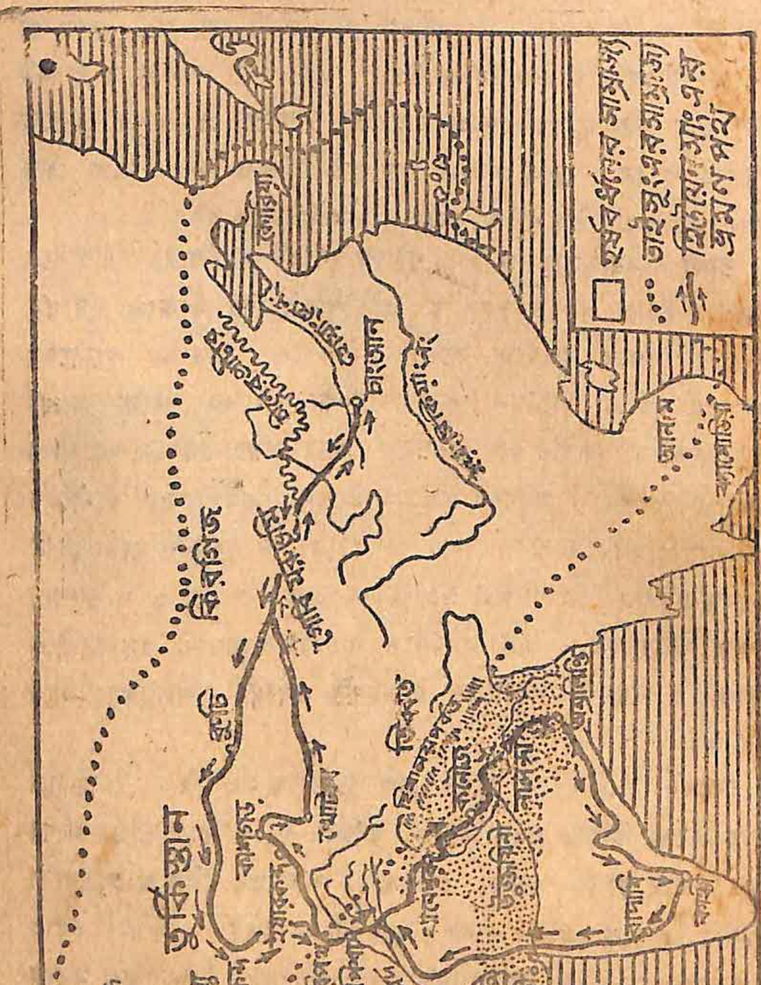
হর্ষবর্ধন ছিলেন থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশীয় রাজা প্রভাকরবর্ধনের দ্বিতীয় পুত্র। প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যবর্ধন

থানেশ্বরের সিংহাসনে বসেন। এই সময়ে মালবের রাজা দেবগুপ্ত ও গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের সম্মিলিত আক্রমণে মৌখরিরাজ গ্রহবর্মণ পরাজিত ও নিহত হন এবং তাঁহার স্ত্রী রাজ্যশ্রী বন্দী হন। রাজ্যশ্রী ছিলেন থানেশ্বররাজ রাজ্যবর্ধনের ভগ্নী। এই সংবাদ পাইয়া রাজ্যবর্ধন গ্রহবর্মণের হত্যার প্রতিশোধ লইবার উদ্দেশ্যে দেবগুপ্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। যুদ্ধে দেবগুপ্ত পরাজিত ও নিহত হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেবগুপ্তের মিত্র শশাঙ্ক কর্তৃক রাজ্যবর্ধন নিহত হন।

রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর ৬০৬ খৃষ্টাব্দে হর্ষবর্ধন থানেশ্বরের সিংহাসনে বসেন। ইহার পর ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধগ্রহণের উদ্দেশ্যে হর্ষবর্ধন শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। ইতিমধ্যে রাজ্যশ্রী কনৌজের কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া বিন্ধ্য পর্বতের অরণ্যে আশ্রয় লইয়াছিলেন। সেখান হইতে ভগ্নীকে উদ্ধার করিয়া হর্ষবর্ধন থানেশ্বরে প্রত্যাবর্তন করেন। গ্রহবর্মণ অপুত্রক ছিলেন। এমতাবস্থায় কনৌজের শাসনভারও হর্ষবর্ধন গ্রহণ করেন। মৌখরী ও পুষ্যভূতি রাজ্য দুইটি ঐক্যবদ্ধ হইবার ফলে গাঙ্গেয় উপত্যকায় এক বিশাল ও শক্তিশালী রাজ্যের উদ্ভব হয়। এই সম্মিলিত রাজ্যের রাজধানী হর্ষ কনৌজে স্থানান্তরিত করেন। কনৌজের ইতিহাসে হর্ষবর্ধন 'শিলাদিত্য' নামে পরিচিত।

হর্ষবর্ধন ছিলেন সে যুগের এক পরাক্রান্ত নরপতি। গৌড়রাজ শশাঙ্ক ছিলেন তাঁহার প্রধান শত্রু। হর্ষবর্ধন কামরূপরাজ ভাস্করবর্মণের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া একত্রভাবে শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। এ যুদ্ধে হর্ষবর্ধন সফল হইতে পারেন নাই। কেননা ইহার পর শশাঙ্ক অনেকদিন পর্যন্ত গৌড়ে রাজত্ব করেন। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর হর্ষবর্ধন শশাঙ্কের রাজ্য মগধ ও গৌড় অধিকার করেন। তিনি কঙ্গোদরাজ্য (বর্তমান উড়িষ্যার গঞ্জাম জেলা) জয় করেন। পশ্চিম ভারতের বলভীরাজ ধ্রুবসেনকে তিনি পরাস্ত করেন। সম্ভবতঃ তিনি সিন্ধু ও কাশ্মীরেও অভিযান করিয়াছিলেন। ৬৪৩ খৃষ্টাব্দের পূর্বে হর্ষবর্ধন দাক্ষিণাত্যের নর্মদা নদী অতিক্রম করিয়া চালুক্যরাজ দ্বিতীয়

পুলকেশীর রাজ্য আক্রমণ করেন। কিন্তু চালুক্যরাজের নিকট পরাজিত হইবার ফলে হর্ষবর্ধন নর্মদা নদীর দক্ষিণে রাজ্যবিস্তারে সক্ষম হন নাই



হর্ষবর্ধন সমগ্র উত্তর ভারতের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়া সকলোত্তরা পথনাথ' বলিয়া নিজেকে ঘোষণা করেন এবং ইহাই রাষ্ট্রীয় ঐক্যের আদর্শরূপে স্বীকৃতি লাভ করে।

হর্ষবর্ধন উত্তর ভারতে একজন সুযোগ্য সম্রাট ছিলেন। রাজ্য বিজেতা, সুশাসক ও প্রজানুরঞ্জক হিসাবে তিনি ছিলেন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি। তাঁহার সময়ে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ছিল। প্রজাদের মঙ্গল ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি হর্ষবর্ধনের লক্ষ্য ছিল।

হর্ষবর্ধন ছিলেন ধর্মপরায়ণ ও দানশীল। নিজে বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরাগী হইলেও অপর ধর্মের প্রতি তিনি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। কনৌজে তিনি এক ধর্মসভা আহ্বান করেন। প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর প্রয়াগের মেলায় হর্ষবর্ধন দীন-দুঃখীদের মুক্তহস্তে দান করিতেন। ইহা ছাড়া, রাজকোষ হইতে দরিদ্রদের অর্থ সাহায্যও করা হইত।

হর্ষবর্ধন ছিলেন বিদ্যানুরাগী ও বিদ্যোৎসাহী। 'নাগানন্দ', 'রত্নাবলী' ও 'প্রিয়দর্শিকা' নামে তিনি তিনখানি সংস্কৃত নাটক রচনা করেন। সুপ্রসিদ্ধ 'হর্ষচরিত' ও 'কাদম্বরী' রচয়িতা কবি বাণভট্ট ছিলেন তাঁহার সভাকবি।

প্রায় চল্লিশ বৎসর রাজত্বের পর ৬৪৬ অথবা ৬৪৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট হর্ষবর্ধন ইহলোক ত্যাগ করেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হিউয়েন সাঙের ভ্রমণ কাহিনী ও তাঁহার ভারত বিবরণ

স্বনামধন্য চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্‌ হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে ভারতে আসেন। ৬২৯ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে চীন হইতে যাত্রা করিয়া ৬৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি গান্ধার প্রদেশে উপনীত হন।

চীন হইতে ভারতবর্ষ প্রায় তিন চার হাজার মাইলের পথ। পথ অতি দুর্গম, বিপদ পদে পদে, খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় জল দুষ্প্রাপ্য। বহু নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, অরণ্য-প্রান্তর অতিক্রম করিয়া তিনি প্রথমে প্রবেশ করেন গোবি মরুভূমিতে। এই মরুভূমিতে অনন্ত বালুকারাশির মধ্যে তিনি পথ হারাইয়া ফেলেন। কয়েকদিন এক ফোঁটা জলও তাঁহার ভাগ্যে জুটে নাই। শেষ পর্যন্ত বহু কষ্টে গোবি মরুভূমি পার

হইয়া তুরফান, কারাশর ও কুচা প্রভৃতি অঞ্চলের মধ্য দিয়া তুষারাবৃত দুর্গম তিয়েনশান পর্বত অতিক্রম করিয়া তিনি উপস্থিত হন তুর্কীস্থানে। সেখান হইতে তাসখন্দ ও সমরকন্দ হইয়া তিনি বাহ্লাক দেশে পৌছেন। ইহার পর তিনি হিন্দুকুশ পর্বত পার হইয়া খাইবার গিরিপথ দিয়া কপিশা (বর্তমান কাবুল), নগরহার, পুরুষপুর (বর্তমান পেশোয়ার) পথে রাখিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। ভারতে চৌদ্দ বৎসর অতিবাহিত করিয়া বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রে প্রভূত জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া এবং বহু মূল্যবান পুঁথি সংগ্রহ করিয়া ৬৪৪ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

হিউয়েন সাঙের ভারত বিবরণ: হিউয়েন সাঙ্ উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বহু অঞ্চল পরিদর্শন করেন। এই সব অঞ্চলের নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এক সারগর্ভ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া যান। তাঁহার এই বিবরণী মধ্যযুগের ভারতীয়-ইতিহাসের এক মূল্যবান দলিল। হিউয়েন সাঙের বিবরণী হইতে হর্ষবর্ধনের শাসন ব্যবস্থা, তাঁহার ধর্মপ্রাণতা ও দানশীলতা, সে যুগের ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি এবং ভারতবাসীর জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়।

হিউয়েন সাঙ্ হর্ষবর্ধনকে অক্লান্ত পরিশ্রমী ও প্রজাহিতৈষী রাজা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। হর্ষবর্ধনের শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে তিনি বলেন, রাজা নিজে রাজ্যের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাঁহার রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা তত্ত্বাবধান করিতেন। দেশের নানাস্থানে বহু চিকিৎসালয়, অতিথিশালা ও অনাথ আশ্রম স্থাপিত হইয়াছিল। রাজকর খুব কম ছিল। প্রজাদের সুখ-সুবিধার জন্য নজর দেওয়া হইত। কাহাকেও বেগার খাটানো হইত না হর্ষের সময়ে গুপ্তযুগের তুলনায় দণ্ডবিধি কঠোরতর হইলেও দেশে চোর ডাকাতের উপদ্রব ছিল। হিউয়েন সাঙ্ নিজেই একাধিকবার এদেশে দস্যুদল কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন।

হর্ষবর্ধনের ধর্মপরায়ণতা ও দানশীলতা প্রসঙ্গে হিউয়েন সাঙ্ কনৌজের ধর্মসভা এবং প্রয়াগের দানযজ্ঞের কথা উল্লেখ করেন। হিউয়েন সাঙ বলেন, প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর গঙ্গা ও যমুনা নদীর পবিত্র সঙ্গমস্থলে প্রয়াগে এক মেলা বসিত এবং এই মেলায় হর্ষবর্ধন অকাতরে

দান করিতেন। প্রয়াগের মেলা 'মহামোক্ষক্ষেত্র' বা 'সন্তোষক্ষেত্র' নামে পরিচিত ছিল।

হিউয়েন সাঙ্ ভারতীয়দের নৈতিক চরিত্রের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন যে, ভারতীয়রা স্বভাবে ছিল সৎ, সরল, সত্যবাদী, ন্যায়-পরায়ণ, অতিথিবৎসল ও ধার্মিক। জনসাধারণের মধ্যে বেশভূষার কোন বাহুল্য ছিল না। তাহাদের জীবনযাত্রা ছিল সরল ও অনাড়ম্বর। জ্ঞানীগুণীর তাহারা সমাদর করিত। কৃষিই ছিল ভারতীয়দের প্রধান উপজীবিকা। শিল্প ব্যণিজ্যেও তাহাদের দক্ষতা ছিল। ভারতবর্ষের সহিত তখন পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল।

হিউয়েন সাঙ্ তাঁহার বিবরণীতে কনৌজ, প্রয়াগ, মথুরা, উজ্জয়িনী, থানেশ্বর, বারাণসী, তাম্রলিপ্ত, পুণ্ড্রবর্ধন প্রভৃতি সমৃদ্ধিশালী নগরের বর্ণনা করেন। দক্ষিণভারতের চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর শৌর্য-বীর্য, অমরাবতীর বৌদ্ধ বিহার নাগার্জুনকুণ্ড, কাঞ্চী ও মহাবলীপুর, বাঙ্গালীর বিদ্যানুরাগ ও ধর্মপ্রাণতা, নালন্দা-মহাবিহারের পঠন-পাঠন ইত্যাদি সম্বন্ধে বহু কথা হিউয়েন সাঙের ভারত বিবরণ হইতে জানা যায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

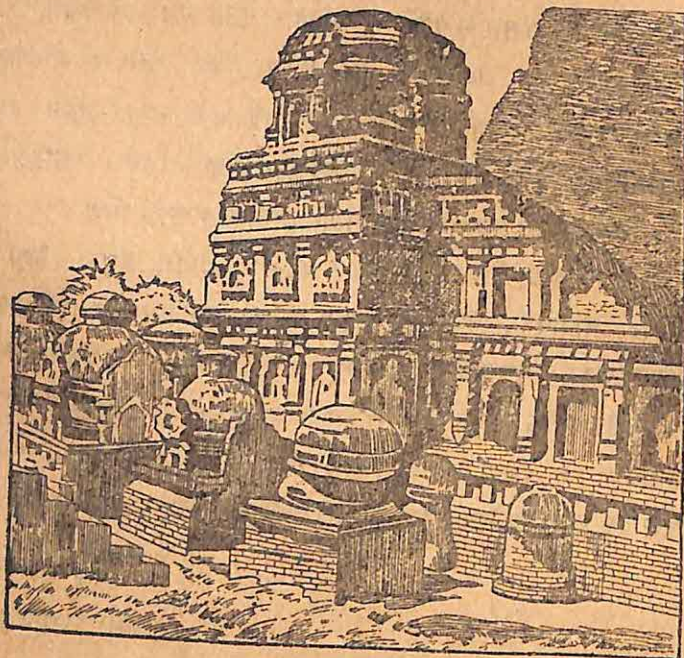
নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল প্রাচীন ভারতের সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যাপীঠ। গুপ্ত ও হর্ষবর্ধনের যুগে ইহার গৌরব ও খ্যাতি সারা এশিয়ায় ছড়াইয়া পড়ে।

বিহার প্রদেশে রাজগীর হইতে সাত মাইল উত্তরে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত ছিল। বর্তমানে মৃত্তিকাগর্ভ হইতে ইহার বিশাল ধ্বংসস্তূপ বিদ্যালয়ের বিরাটত্বের সাক্ষ্য বহন করে এবং সকলের বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

হিউয়েন সাঙ্ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে দুইবৎসর বৌদ্ধ শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করেন এবং এই বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। চারিদিক প্রাচীর দিয়া ঘেরা সঘন আম্রকুঞ্জের স্নিগ্ধছায়া ও স্বচ্ছসলিলা সরোবরের প্রস্ফুটিত শ্বেত-রক্ত কমলদলের কমনীয় শোভার

মধ্যে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুতলবিশিষ্ট প্রাসাদ, বড় বড় হলঘর ও সুউচ্চ শিখরবিশিষ্ট বৌদ্ধ-বিহার ছিল। গুপ্ত রাজারা, হর্ষবর্ধন, পালরাজারা এবং সুমাত্রার রাজা বালপুত্রদেব এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকগুলি সঙ্ঘারাম ও বিহার নির্মাণ করেন।



নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে দশ হাজারেরও অধিক ছাত্র অধ্যয়ন করিত এবং প্রায় এক হাজার অধ্যাপক অধ্যাপনা কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। মধ্যএশিয়া, চীন, কোরিয়া, তিব্বত প্রভৃতি দূর দেশ হইতে ছাত্ররা আসিত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইবার জন্য ছাত্রদের কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইত। ছাত্রদের এখানে পড়াশুনা ও থাকা-খাওয়ার জন্য কোন খরচ লাগিত না। রাজাদের দেওয়া বহু গ্রামের উপস্বত্ব হইতে নালন্দার ব্যয় নির্বাহ হইত।

বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র ছাড়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাকরণ, দর্শন, আয়ুর্বেদ, গণিত, হিন্দুধর্মশাস্ত্র, জ্যোতিষ, শিল্পকলা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে পঠন-

পাঠান হইত। শিক্ষকরা প্রত্যেকেই ছিলেন বহু বিষয়ে অসাধারণ পারদর্শী। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পঠন-পাঠন চলিত। ছাত্র ও অধ্যাপক বিশ্ববিদ্যালয়েই থাকিতেন। কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলা সকলকে মানিয়া চলিতে হইত। বিশ্ববিদ্যালয়ে 'রত্নসাগর', 'রত্নোদধি' ও 'রত্নরঞ্জক' নামে তিনটি বৃহৎ গ্রন্থাগার ছিল। হিউয়েন সাঙের সময়ে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন বাঙ্গালী মহাপণ্ডিত শীলভদ্র। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল। একদা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল সারা এশিয়ার চেতন কেন্দ্র এবং বৌদ্ধধর্মের আন্তর্জাতিক বিকিরণ কেন্দ্র। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল সে যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যেরও অপূর্ব নিদর্শন।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বঙ্গবিজেতা বক্তিয়ার খলজীর আক্রমণে এই বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস হইয়াছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হর্ষোত্তর যুগ : ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহের উত্থান : রাজপুত জাতির অভ্যুত্থান

ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সম্রাট হর্ষবর্ধন চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন সত্য কিন্তু দীর্ঘ রাজত্বকালে তিনি তাঁহার সাম্রাজ্যকে কোন সুদৃঢ় রাষ্ট্রশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাই তাঁহার মৃত্যুর পর চারিদিকে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল এবং উত্তর ভারতে স্থানীয় রাজারা স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিলেন। শুধু তাহাই নহে, প্রাধান্য বিস্তারের জন্য তাঁহারা পরস্পর আত্মকলহে লিপ্ত হইলেন। ফলে অচিরেই হর্ষবর্ধনের বিশাল সাম্রাজ্যসৌধ তাসের ঘরের মত ভাঙ্গিয়া পড়িল, রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হইল। হর্ষের মৃত্যুর পর অর্ধ শতাব্দীকাল উত্তর ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল তিমিরাচ্ছন্ন। হর্ষোত্তর যুগে উত্তর ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় এবং হর্ষের মৃত্যুর পর পাঁচশত বৎসরের মধ্যে সমগ্র উত্তরভারতে কোন সার্বভৌম রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় নাই।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের মধ্যভাগ হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যে উত্তর ভারতে কয়েকটি শক্তিশালী রাজপুত রাজবংশের অভ্যুদয় ঘটে। এই রাজপুত রাজগণ কেবলমাত্র উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই খ্যাতিলাভ করেন নাই, তাঁহারা বিধর্মী মুসলমানদের আক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া হিন্দু ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য যে অপরিসীম বীরত্ব ও আত্মত্যাগের আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাহা ভারতবর্ষের ইতিহাসে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

রাজপুত জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। রাজপুতরাজারা নিজেদের সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয়ক্ষত্রিয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রাজপুত জাতির বিভিন্ন শাখা রামায়ণ ও মহাভারতের বীর নায়কদের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। নৃতত্ত্ববিদগণ রাজপুত জাতিকে আর্যজনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই অভিমত সর্বজনগ্রাহ্য হয় নাই। বর্তমান যুগের অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে শক হূণ গুর্জর প্রভৃতি জাতির সহিত ভারতীয় জাতি, উপজাতি সমূহের মিশ্রণে রাজপুত জাতির উদ্ভব হইয়াছে।

রাজপুত জাতির মধ্যে রাজপুতানার দক্ষিণাংশে গুর্জর-প্রতিহার বংশ, মালবের পরমার বংশ, আজমীরের চৌহান বংশ, কনৌজের প্রতিহার পরবর্তী গাহড়ওয়াল বংশ, চেদিরাজ্যের কলচুরি বংশ, গুজরাটের চালুক্য বংশ ও বুন্দেলখণ্ডের চন্দেল্ল বংশই ছিল প্রধান।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পাল-প্রতিহার রাষ্ট্রকূট প্রতিদ্বন্দ্বিতা : ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রগঠনে ব্যর্থতা

কনৌজরাজ হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর উত্তর-ভারতে নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব হয়। কনৌজ ছিল সে যুগের ভারতের এক সমৃদ্ধ নগর, ভারতের মধ্যমণি। কনৌজ অধিকারেই ছিল তখন রাজাদের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয়। তাই কনৌজ অধিকার লইয়া বাংলাদেশের পালবংশ, মালবের গুর্জর প্রতিহার বংশ এবং দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটবংশের এক ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূত্রপাত হয়।

অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে বাংলার পালরাজা ধর্মপাল উত্তর-ভারতে রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে কনৌজ অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু তাঁহাকে বাধা দিতে অগ্রসর হন গুর্জর প্রতিহার অধিপতি বৎসরাজ। বৎসরাজের নিকট ধর্মপাল পরাজিত হন এবং গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী ভূ-ভাগে ধর্মপালের প্রভুত্ব সাময়িকভাবে লুপ্ত হয়। তিনি অনতিকাল মধ্যেই বৎসরাজ রাষ্ট্রকূট নরপতি ধ্রুবের হস্তে পরাজিত হইয়া রাজপুতনায় আশ্রয় লন। ইহার পর ধ্রুব ধর্মপালের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। পরে ধ্রুব দাক্ষিণাত্যে প্রত্যাবর্তন করিলে ধর্মপাল কনৌজ অধিকার করিয়া উত্তর-ভারতে আধিপত্য বিস্তার করেন। ভোজ, মৎস্য, কুরু অবন্তী, গান্ধার প্রভৃতি দেশের রাজন্যবর্গ ধর্মপালের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন।

ধর্মপালের এই প্রাধান্য বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রতিহার রাজ দ্বিতীয় নাগভট্ট প্রতিহার শক্তি উদ্ধার করিয়া কনৌজ অধিকার করেন এবং পরে বাংলার দিকে অগ্রসর হইয়া মুঙ্গেরের নিকট ধর্মপালকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। পাল সাম্রাজ্যের এই বিপর্যয়ের মুখে রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ নাগভট্টকে আক্রমণ করেন এবং যুদ্ধে তাঁহাকে পরাস্ত করেন। তৃতীয় গোবিন্দ ইহার পর দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া গেলে পাল সাম্রাজ্য রক্ষা পায় এবং ধর্মপাল মৃত্যুকাল পর্যন্ত আপন প্রভুত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হন।

এই ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, হর্ষোত্তর যুগে উত্তর ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে একত্র করিয়া কেহই ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র গঠন করিতে পারে নাই। ভারতের বুকে তখন কয়েকটি ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য এবং তাহাদের অধীনে কিছু সংখ্যক উপ-সামন্ত রাজ্য গড়িয়া উঠে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

গুপ্তোত্তর যুগে বাংলা : রাজা শশাঙ্ক

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের একেবারে গোড়ার দিকে রাজা শশাঙ্ক গৌড়ে এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। উত্তর-পশ্চিম বঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ লইয়া গৌড় রাজ্যটি গঠিত হয়। রাজা

শশাঙ্কের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। অনেকে মনে করেন, বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের নিকটে রাঙ্গামাটি নামক স্থানটিই 'কর্ণসুবর্ণ' নামে একদা পরিচিত ছিল।

শশাঙ্ক প্রথম জীবনে গুপ্ত সম্রাট মহাসেনগুপ্তের অধীনে মহাসামন্ত ছিলেন। পরে গুপ্ত রাজাদের দুর্বলতার সুযোগে ৬০৬ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই স্বাধীন নরপতিরূপে গৌড় শাসন করিতে থাকেন।

বঙ্গ ও মগধের নানাস্থানে শশাঙ্কের নামে বহু স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে অনুমান করিতে অসুবিধা হয় না যে, গৌড়ের বাহিরেও তাঁহার আধিপত্য বিস্তৃত ছিল।

রাজা শশাঙ্ক ছিলেন একজন পরাক্রান্ত নরপতি। তাঁহার রণনৈপুণ্যে বঙ্গদেশ সপ্তম শতাব্দীর ভারতের ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হইয়াছিল। শশাঙ্ক দণ্ডভুক্তি (বর্তমান মেদিনীপুর জেলা), উৎকল (বর্তমান উড়িষ্যা) এবং কঙ্গোদরাজ্য (বর্তমান গঞ্জাম জেলা) জয় করেন সম্ভবতঃ তিনি পূর্ববঙ্গ জয় করিয়া সমগ্র বাংলায় তাঁহার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মগধও জয় করিয়াছিলেন এবং পশ্চিমে তাঁহার রাজ্যসীমা বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। এই ভাবে অল্পসময়ের মধ্যে শশাঙ্ক এক বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপন করেন।

ইহার পর শশাঙ্ক আর্যাবর্তে গৌড়ের প্রাধান্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে মালবরাজ দেবগুপ্তের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া কনৌজ ও থানেশ্বরের দুই প্রধান শক্তির বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ প্রতিরোধ গঠন করেন। কনৌজরাজ গ্রহবর্মণ নিহত হইলে থানেশ্বররাজ রাজ্যবর্ধন দেবগুপ্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করেন। কিন্তু রাজা শশাঙ্কের হস্তে রাজ্যবর্ধন নিহত হন।

রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর হর্ষবর্ধন শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। কিন্তু শশাঙ্কের বিরুদ্ধে হর্ষের অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই কেননা রাজা শশাঙ্ক ইহার পরও অনেকদিন পর্যন্ত স্বাধীনভাবে গৌড়ে রাজত্ব করেন।

শশাঙ্কের কৃতিত্ব : রাজা শশাঙ্কের প্রধান কৃতিত্ব এই যে তিনিই

সর্বপ্রথম বাংলায় স্বাধীন সার্বভৌম বাঙ্গালী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনিই প্রথম বাংলায় এক ঐক্যবদ্ধ রাজ্য গঠন করেন। শশাঙ্কের নেতৃত্বেই বঙ্গদেশ ভারতবর্ষের ইতিহাসে সর্বপ্রথম গুরুত্ব অর্জন করে এবং ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর শক্তি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে, শশাঙ্কের বিশেষ কৃতিত্ব এই যে তিনি থানেশ্বর ও কামরূপের মিলিত আক্রমণ প্রতিহত করিয়া স্বীয় সাম্রাজ্য ও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। স্বাধীনচেতা, বীর, রণনিপুণ ও প্রতাপশালী নরপতি হিসাবে বাংলার ইতিহাসে তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। রাজা শশাঙ্ক বাংলার তথা বাঙ্গালীর গৌরব।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পাল ও সেনযুগে বাঙ্গালীর জীবনযাত্রা ও সমাজ

ভারতবর্ষের ইতিহাসে পাল ও সেন রাজাদের রাজত্বকাল এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। রাজা শশাঙ্কের পর প্রায় একশত বৎসর ব্যাপিয়া ছিল বাংলায় অন্ধকার যুগ। তারপরে ৭৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রায় পাঁচশত বৎসর পাল ও সেন রাজাদের আমলে সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে বাংলাদেশ গৌরবের চরম শিখরে উপনীত হয়।

পাল ও সেনযুগে বাঙ্গালী সহজ ও সরল জীবন যাপন করিত। দেশে শৃঙ্খলা ছিল, খাদ্যের অভাব ছিল না, মানুষের মনে সুখ শান্তি ছিল। কবি সন্ধ্যাকর নন্দী তাঁহার 'রামচরিত' গ্রন্থে বাংলাকে সুজলা-সুফলা শস্যশ্যামলা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

সে যুগে বাঙ্গালীরা বেশীর ভাগ গ্রামেই বাস করিত। বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য ছিল ভাত, ডাল, মাছ, শাকসব্জী, দুধ, ঘি ইত্যাদি। চিঁড়া, খই, খাজা, মোয়া, নাড়ু বাঙ্গালীর বিশেষ প্রিয় ছিল।

গ্রামবাসীদের পোষাক-পরিচ্ছদের কোন আড়ম্বর ছিল না। নগরের নাগরিকরা অবশ্য বিলাসপ্রিয় ছিল। পুরুষেরা খাটো ধুতি পরিত। নারীরা শাড়ী পরিত। নারী পুরুষ উভয়েই সে যুগে নানা প্রকার অলঙ্কার ব্যবহার করিত।

পাল ও সেন যুগে বাংলায় বারো মাসে তের পার্বন অনুষ্ঠিত হইত। সে যুগে বাঙ্গালীর প্রধান উৎসব ছিল দুর্গাপূজা। মহাধুমধামের সহিত দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হইত। অন্যান্য উৎসবের মধ্যে চড়ক ও হোলি জনপ্রিয় ছিল। উৎসব অনুষ্ঠানে ও পূজাপার্বনে নৃত্য-গীত ও অভিনয় এবং অন্যান্য আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা থাকিত। ঢাক, ঢোল, খোল, মাদল, বাঁশি, করতাল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের সে যুগে প্রচলন ছিল। খেলা ধূলার মধ্যে শিকার, কুস্তি, দাবা, পাশা ও নানা প্রকার জুয়া খুব জনপ্রিয় ছিল। যানবাহনের মধ্যে সে সময় প্রধান ছিল গোরুর গাড়ি ও নৌকা। ধনী ব্যক্তিরা হাতী ঘোড়া ও পাল্কী ব্যবহার করিতেন।

পাল ও সেন যুগে জনসাধারণের অধিকাংশই ছিল কৃষিজীবী। ইহা ছাড়া, সে যুগের সমাজে ছিল কামার, কুমোর, জেলে, তাঁতী, মালাকার, গন্ধবেনে, সেকরা প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর লোক। সমাজে চণ্ডাল, শবর, ডোম প্রভৃতি অস্পৃশ্য জাতি বলিয়া বিবেচিত হইত।

পাল ও সেনযুগের সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি বর্ণের প্রাদুর্ভাব ছিল। ইহা ছাড়া, সে যুগে কায়স্থ, বৈদ্য ও কৈবর্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। সেন যুগে রাজা বল্লাল সেন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যশ্রেণীর মধ্যে কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন করেন। ইহা হইতে মনে হয় সে যুগে জাতিভেদ কঠোর ভাবে মানা হইত।

পাল ও সেন যুগে নারীদের যথেষ্ট মর্যাদা ছিল। তাহাদের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চা ছিল। পুরুষদের বহুবিবাহ এবং উচ্চবর্ণ নারীদের ক্ষেত্রে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। বিধবা বিবাহ নিন্দনীয় ছিল।

পাল ও সেন যুগে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অগ্রগণ্য ছিল। তাম্রলিপ্ত ও সপ্তগ্রাম ছিল বাংলার বহির্বাণিজ্যের প্রধান বন্দর। এই দুই বন্দর হইতে বাঙ্গালী বণিকগণ সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র ও নানাবিধ পণ্যদ্রব্য লইয়া সমুদ্রপথে সুদূর সিংহল, ব্রহ্মদেশ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যাতায়াত করিত। স্থলপথেও তিব্বত, নেপাল ও মধ্য এশিয়ার সহিত বাংলার বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল।

নবম পরিচ্ছেদ

পাল ও সেনযুগে ধর্ম ও শিক্ষা

ধর্ম ঃ পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ। তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলায় বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রসার হয়। তাঁহারা বাংলায় বহু বৌদ্ধ মঠ ও বিহার নির্মাণ করেন। ভারতের বাহিরেও বিশেষ করিয়া তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম বিস্তারে পালরাজারা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। সে যুগে পৌরাণিক ধর্মেরও প্রাধান্য ছিল। অন্য ধর্মের প্রতি পাল রাজারা উদার ছিলেন। সেন যুগে বাংলায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাধান্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। সেনরাজগণ শৈব বা বৈষ্ণব ধর্মের অনুরাগী ছিলেন তাঁহাদের আমলে বালায় বৌদ্ধধর্ম বিলুপ্ত হয়।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি ঃ পাল ও সেনযুগ শিক্ষা-সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ। পালযুগে বৌদ্ধধর্ম চর্চা ও সংস্কৃত শিক্ষার বিশেষ প্রসার ঘটে। পালযুগে বৌদ্ধধর্ম চর্চা ও শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল উদণ্ডপুর, বিক্রমশীলা এবং নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। পালরাজ গোপাল নালন্দার নিকটে উদণ্ডপুর মহাবিহার নির্মাণ করেন। প্রসিদ্ধ আচার্য শীলরক্ষিত ছিলেন এখানকার অধ্যক্ষ। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান এই মহাবিহারে শিক্ষা লাভ করেন। পালরাজ ধর্মপাল ভাগলপুর জেলার পাথরঘাট অঞ্চলে গঙ্গার তীরে বিক্রমশীলা মহাবিহার নির্মাণ করেন। এখানে তিন হাজার ছাত্র অধ্যয়ন করিত এবং একশত চৌদ্দজন বিশিষ্ট পণ্ডিত বৌদ্ধশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, ব্যাকরণ, দর্শন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। এমন কি তিব্বত হইতে বহু শিক্ষার্থী এখানে অধ্যয়ন করিতে আসিত। এই মহাবিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। পালরাজারা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

পাল রাজারা বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যও এই যুগে প্রাণ সঞ্চার হইয়াছিল কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' সংস্কৃত কাব্যটি সে যুগে বিশেষে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল।

পালযুগে 'চর্যাপদ' নামে বৌদ্ধ দোঁহা ও সঙ্গীত রচিত হইয়াছিল। এই চর্যাপদগুলি প্রাচীন বাংলা ভাষার নিদর্শন। পালযুগের বৌদ্ধ বিহারগুলি এবং দেবদেবীর মূর্তিগুলি পালযুগের উন্নত স্থাপত্য ও ভাস্কর্যশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। পালযুগে ধীমান ও বিটপাল ছিলেন প্রস্তর ও ধাতুশিল্পে প্রখ্যাত শিল্পী। পালযুগের শিল্পরীতি সুদূর চীন, তিব্বত, ব্রহ্মদেশ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রভাব বিস্তার করে।

বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সেনরাজাদের অবদান কম নহে। সেনযুগে বাংলায় সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চরম উন্নতি হইয়াছিল। সেন রাজারা শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বল্লাল সেন নিজেই সংস্কৃতে 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুত সাগর' নামে দুইটি গ্রন্থ রচনা করেন। লক্ষ্মণ সেনও সুসাহিত্যিক ছিলেন। সে যুগের খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ লক্ষ্মণ সেনের রাজসভা অলংকৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার সভাকবি জয়দেব ভারতের সর্বত্র সমাদৃত 'গীতগোবিন্দম্' কাব্য রচনা করেন। লক্ষ্মণসেনের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত হলায়ুধ 'ব্রাহ্মণ সর্বস্ব', পণ্ডিত সর্বস্ব' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

সেনযুগে বাংলা শিল্পকলারও প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল। শূলপাণি ছিলেন সেন যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী।

দশম পরিচ্ছেদ

হর্ষোত্তর যুগে দক্ষিণভারত : বাদামীর চালুক্য বংশ

বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণ হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ সাধারণভাবে 'দাক্ষিণাত্য' বা 'দক্ষিণাপথ' নামে পরিচিত। হর্ষোত্তর যুগে দক্ষিণ ভারতে বাদামীর চালুক্য বংশ, কাঞ্চীর পল্লব বংশ, তাঞ্জোরের চোল বংশ, মহারাষ্ট্রের রাষ্ট্রকূট বংশ প্রভৃতি শক্তিশালী হইয়া উঠে।

বাদামীর চালুক্য বংশ : খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের প্রথমভাগে দক্ষিণ ভারতে বর্তমান বিজাপুর জেলার অন্তর্গত বাতাপী বা বাদামী নগরকে কেন্দ্র করিয়া চালুক্য রাজবংশের উদ্ভব হয়। এইজন্য এই বংশকে বাতাপী বা বাদামীর চালুক্য বংশ বলা হয়। কিংবদন্তী আছে যে

চালুক্যগণ মনু বা অযোধ্যার চন্দ্রবংশ হইতে উদ্ভূত। কিন্তু মনে হয় চালুক্যগণ দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন কানাড়ীদের বংশধর। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের প্রথম ভাগে জয়সিংহের নেতৃত্বে প্রথম চালুক্যরাজ্য গড়িয়া উঠে। কিন্তু ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রথম পুলকেশী স্বাধীন চালুক্য রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান হইতে অনুমান করা যায় যে, তিনি পার্শ্ববর্তী রাজ্য সমূহের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন।


অজন্তার গুহাচিত্র : মা ও ছেলে

চালুক্য বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন দ্বিতীয় পুলকেশী (৬৪ খৃঃ ৬৪২ খৃঃ)। তিনি ছিলেন পরাক্রমশালী রাজা। তিনি শুধু হর্ষবর্ধনের প্রবল আক্রমণকেই প্রতিহত করেন নাই, তিনি গুজরাট, মালব, মহীশূর, কোঙ্কন প্রভৃতি অঞ্চলেও আপন প্রভুত্ব স্থাপন করেন। সুদূর দক্ষিণের চোল, চের ও পাণ্ড্যরাজ্যের রাজারাও তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি পল্লবরাজ নরসিংহ বর্মণের সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন (৬৪২ খৃঃ)। হিউয়েন সাঙ্ পুলকেশীর সামরিক শক্তি ও রাজ্যের সমৃদ্ধির প্রশংসা করেন।

দ্বিতীয় পুলকেশীর পুত্র প্রথম বিক্রমাদিত্য পল্লবদের পরাভূত করিয়া চালুক্য শক্তি পুনঃস্থাপিত করেন। শেষ পর্যন্ত ৭৫৩ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রকূটরাজ দন্তিদুর্গ বিজয়াদিত্যের পুত্র দ্বিতীয় কীর্তিবর্মণকে পরাজিত করিলে চালুক্য বংশের অবসান ঘটে।

চালুক্য রাজারা শিল্পানুরাগী ছিলেন। তাঁহাদেরই রাজত্বকালে অজন্তায় প্রসিদ্ধ বহু গুহা-চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল এবং এলিফেন্টার গুহামন্দির নির্মিত হইয়াছিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

কাঞ্চীর পল্লব বংশ

খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের শেষ দিকে কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে কাঞ্চী নগরকে কেন্দ্র করিয়া পল্লব রাজ্য গড়িয়া উঠে। পল্লব জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মত দেখা যায়। কেহ কেহ পল্লবগণকে বাকাটক বংশের একটি শাখা এবং ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অনেকে উহাদের চোল-নাগ বংশসম্ভূত বলিয়া মনে করেন।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষ ভাগে সিংহবিষ্ণু নামে এক পরাক্রান্ত রাজা কাঞ্চীর সিংহাসনে বসেন এবং এই সময় হইতেই পল্লব বংশের গৌরবময় যুগের সূচনা হয়। তিনি চোল, চের ও পাণ্ড্য রাজাদের পরাজিত করিয়া পল্লব রাজ্য বিস্তার করেন। তিনি সিংহলের রাজাকেও পরাজিত করেন।

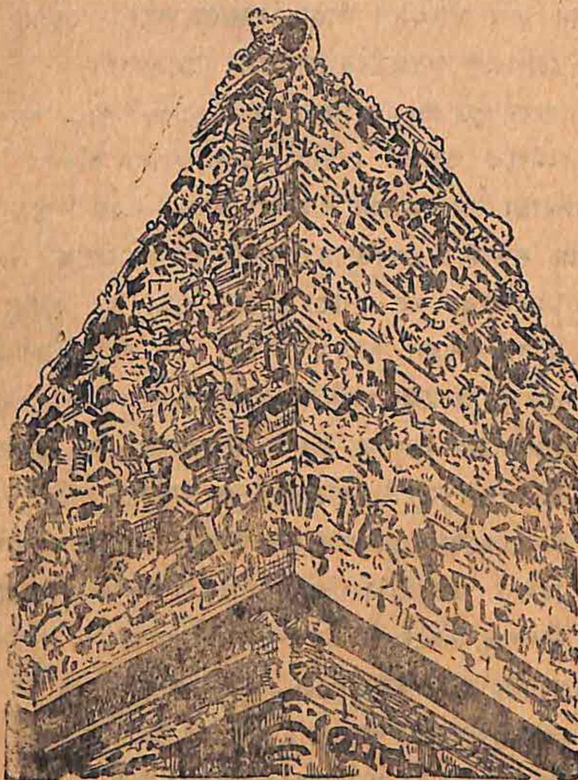
সিংহবিষ্ণুর পুত্র প্রথম মহেন্দ্রবর্মণ সপ্তম শতকের প্রথম দিকে রাজত্ব করেন। তিনি নানাগুণে ভূষিত ছিলেন বলিয়া 'বিচিত্রচিত্ত' নামে খ্যাত ছিলেন। তিনি শিল্প, সাহিত্য ও সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে ত্রিচিনপল্লীতে পাহাড় কাটিয়া কয়েকটি সুন্দর সুন্দর মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। তিনি চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর নিকট পরাজিত হন এবং পল্লব-চালুক্যের সংগ্রাম শুরু হয়।

পল্লববংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন মহেন্দ্রবর্মণের পুত্র নরসিংহবর্মণ (৬৩০—৬৬৮ খৃঃ)। তিনি দ্বিতীয় পুলকেশীকে পরাজিত করিয়া চালুক্যদের বাদামী রাজ্য দখল করেন। তিনি এক শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠন করেন এবং দুইবার সিংহল দ্বীপ আক্রমণ করেন।

নরসিংহবর্মণের পরবর্তী রাজারা দুর্বল ছিলেন। চালুক্যদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তাঁহাদের ছিল না। শেষ পর্যন্ত নবম শতাব্দীর শেষভাগে চোলরাজ প্রথম আদিত্য পল্লবরাজ অপরাজিত বর্মণকে পরাজিত করিয়া পল্লব রাজ্য ধ্বংস করেন (৮৯১ খৃঃ)।

পল্লব স্থাপত্য ও শিল্পকলা ঃ পল্লব রাজারা স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পল্লবরাজ নরসিংহ বর্মণের রাজত্বকালে

মহাবলীপুরমের বিখ্যাত রথমন্দিরগুলি এবং নরসিংহ বর্মণের প্রপৌত্র দ্বিতীয় নরসিংহবর্মণের রাজত্বকালে কাঞ্চীর প্রসিদ্ধ কৈলাসনাথের



দক্ষিণ ভারতের (কাপালীশ্বরের) মন্দির (মাদ্রাজ)

মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। এই সব মন্দিরগুলি পল্লব স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

চোলবংশ ও চোলদের সামুদ্রিক তৎপরতা

চোলগণ সুদূর দক্ষিণ ভারতের এক অতি প্রাচীন জাতি। আনুমানিক খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে কারিকালের নেতৃত্বে চোলগণ এক শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। সম্রাট অশোকের সময়ে স্বাধীন চোলরাজ্য ছিল। কালক্রমে পল্লব, চের ও পাণ্ড্য রাজ্যগুলির ক্রমাগত আক্রমণে চোল রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে বিজয়ালয়ের নেতৃত্বে চোলবংশ পুনরায় শক্তিশালী হইয়া উঠে। তিনি পাণ্ড্যদের নিকট হইতে তাঞ্জোর দখল করেন এবং তাঞ্জোরে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন। সেই অবধি এই চোলবংশ 'তাঞ্জোরের চোলবংশ' নামে খ্যাত।

বিজয়ালয়ের পুত্র প্রথম আদিত্য (৮১৭ খৃঃ-৯০৭ খৃঃ) পল্লব রাজ অপরাজিতবর্মণকে পরাভূত করিয়া পল্লবশক্তি ধ্বংস করেন। তাঁহার সময়ে চোলরাজ্য উত্তরে মাদ্রাজ ও দক্ষিণে কাবেরী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগে চোলরাজ প্রথম রাজরাজ (৯৮০ খৃঃ-১০১৬ খৃঃ) মহীশূরের গঙ্গ, পাণ্ড্য ও চের রাজ্য জয় করিয়া সমুদ্র অতিক্রম করিয়া সিংহল আক্রমণ করেন এবং উহার উত্তরাঞ্চল জয় করেন। প্রথম রাজরাজের অধীনে এক শক্তিশালী নৌবহর ছিল।

চোলবংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন রাজরাজের পুত্র রাজেন্দ্রচোল (১০১৬ খৃঃ-১০৪৪ খৃঃ)। শৌর্যেবীর্যে ও খ্যাতিতে তিনি পিতাকেও অতিক্রম করিয়াছিলেন। পিতার ন্যায় তাঁহারও এক প্রচণ্ড শক্তিশালী নৌবহর ছিল। এই নৌবাহিনীর সাহায্যে তিনি সমগ্র সিংহল, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, ব্রহ্মদেশের একাংশ, মালয়, সুমাত্রা ও যবদ্বীপ জয় করিয়া অবিস্মরণীয় কীর্তি অর্জন করেন। ইহা ছাড়া তিনি মধ্যভারতে কোশল এবং পূর্ব-ভারতে বঙ্গদেশের রাজাদের পরাজিত করেন। এই সময় চোল বংশের সামরিক খ্যাতি সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে।

বৈদেশিক আক্রমণ এবং চালুক্য ও পাণ্ড্যদের শত্রুতায় চোল বংশের পতন শুরু হয়। অবশেষে ১৩১০ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দিন খলজীর সেনাপতি মালিক কাফুরের আক্রমণের ফলে চোল রাজ্যের বিলোপ ঘটে।

রাজ্যজয় ছাড়াও চোলরাজাগণ শাসনকার্যে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। সমগ্র রাজ্যটিকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়া, গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করিয়া এবং প্রজাদের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি দিয়া চোল রাজাগণ শাসন কার্যে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেন। শিল্প কলায় চোলরাজারা অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঞ্জোরের বিখ্যাত রাজরাজেশ্বর মন্দির চোল শিল্প নৈপুণ্যের সাক্ষ্য বহন করে।

অনুশীলনী

বাস্তবভিত্তিক ও মৌখিক প্রশ্নাবলী :

১। 'অদ্ভুতসাগর' গ্রন্থ কে রচনা করেন ?
২। দন্তিদুর্গ কোন্ বংশীয় রাজা ছিলেন ?
৩। মিহিরগুলের পিতার নাম কি ছিল ?
৪। হর্ষবর্ধনের সভাকবি কে ছিলেন ?
৫। পুরুষপুরের বর্তমান নাম কি ?
৬। প্রথম নাগভট্ট কোন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন ?
৭। ধর্মপাল কোথাকার রাজা ছিলেন ?
৮। কহ্লন কোথাকার অধিবাসী ছিলেন ?
৯। শীলভদ্র কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন ?
১০। কৌলীন্য প্রথা কে প্রবর্তন করিয়াছিলেন ?
১১। 'রত্নাবলী' নামক সংস্কৃত নাটকটির রচয়িতা কে ?
১২। পল্লবরাজ প্রথম মহেন্দ্রবর্মা কি নামে খ্যাত ছিলেন ?
১৩। চোলদের রাজরাজেশ্বর মন্দিরটি কোথায় অবস্থিত ?
১৪। 'গীতগোবিন্দম্' কাব্যটি কে রচনা করেন ?
১৫। বিক্রমশীলা মহাবিহার কে নির্মাণ করেন ?
১৬। পালরাজারা কোন্ ধর্মালম্বী ছিলেন ?
১৭। হর্ষবর্ধনের পিতার নাম কি ছিল ?
১৮। শশাঙ্কের রাজধানী কোথায় ছিল ?
১৯। 'হর্ষচরিত' প্রণেতার নাম কি ছিল ?
২০। 'প্রয়াগের মেলা' কি নামে পরিচিত ছিল ?

সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্নাবলী :

১। হূণদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব কি ?
২। ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্কন্দগুপ্তের নাম স্মরণীয় হইয়া আছে কেন ?
৩। মিহিরগুলের অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা কর।
৪। হর্ষবর্ধনের নেতৃত্বে কিভাবে মৌখরী ও পুষ্যভূতি রাজ্য দুইটি ঐক্যবদ্ধ হয় ?
৫। হর্ষবর্ধনের বিদ্যোৎসাহীতার সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।
৬। চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ কিভাবে ভারতে উপনীত হন ?

৭। হিউয়েন সাঙ ভারতের কোন্ কোন্ নগরের বর্ণনা দিয়াছেন ?

৮। চোলদের সামুদ্রিক তৎপরতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৯। পল্লব স্থাপত্য ও শিল্পকলার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

রচনাত্মক প্রশ্নাবলী ঃ

১। ভারতে হূণ অভিযানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

২। হর্ষবর্ধন কিরূপে 'সকলোত্তরপথনাথ' হইলেন বর্ণনা কর।

৩। হর্ষবর্ধন কিভাবে কনৌজের অধিকার লাভ করেন ? কি কি অঞ্চল তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হইয়াছিল ?

৪। সুশাসক, প্রজানুরঞ্জক, দানশীল ও বিদ্যানুরাগী হিসাবে হর্ষবর্ধনের পরিচয় দাও।

৫। হিউয়েন সাঙ কোন্ সময়ে ভারতে আসেন ? হিউয়েন সাঙের ভারত বিবরণ হইতে সে যুগে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে যাহা জানা যায় সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৬। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় অবস্থিত ছিল ? এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণণা কর।

৭। রাজপুত জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে মতপার্থক্যগুলি উল্লেখ কর। হর্ষোত্তর যুগে উত্তর ভারতে কয়েকটি রাজপুত রাজবংশের নাম কর।

৮। পাল-প্রতিহার-রাষ্ট্রকূট প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৯। শশাঙ্ক কোথাকার রাজা ছিলেন ? তাঁহার বিজয় কাহিনী ও কৃতিত্বের পরিচয় দাও।

১০। পাল ও সেন যুগে বাঙালীর জবীনযাত্রা ও সমাজের বিবরণ দাও।

১১। শশাঙ্ক কোথাকার রাজা ছিলেন ? তাঁহার বিজয় কাহিনী ও কৃতিত্বের পরিচয় দাও।

১২। পাল যুগে ধর্ম ও শিক্ষা-সংস্কৃতির পরিচয় দাও।

১৩। সেন যুগে ধর্ম ও শিক্ষা সংস্কৃতির বিবরণ দাও।

১৪। বাদামী চালুক্যবংশের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখ।

১৫। দক্ষিণ-ভারতের কোন অংশে পল্লব রাজ্য গড়িয়া উঠে ? পল্লববংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে বর্ণনা কর। পল্লব বংশের কৃতিত্ব সংক্ষেপে লেখ।

অধ্যায় ১২

বিদেশের সহিত ভারতের সংযোগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

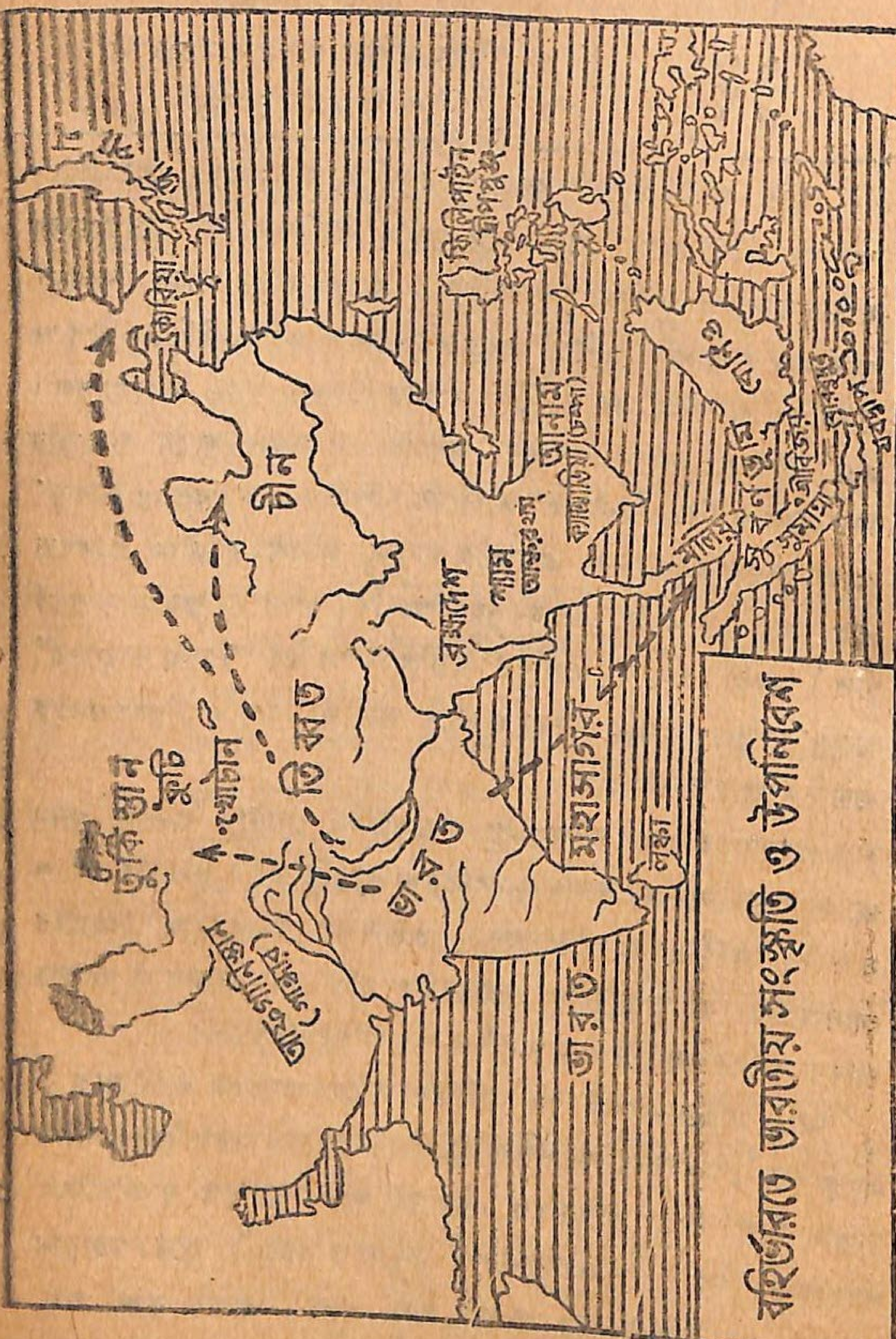
মধ্য এশিয়া ও চীনে মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রসার

অতি প্রাচীনকালেই ভারতবর্ষের সহিত বহির্জগতের যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। সিন্ধু সভ্যতার যুগে ব্যাবিলন এবং মধ্যপ্রাচ্যের সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। খৃষ্টের জন্মের কয়েক শতাব্দী পূর্বে মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া এবং ভারত মহাসাগরীয় বিভিন্ন দ্বীপ ও উপদ্বীপে ভারতীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করিয়াছিল। মধ্য এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যে সকল স্থানে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল তাহাদের সম্মিলিতভাবে "বৃহত্তর ভারত" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। একদিকে গান্ধার, কপিশা, খোটান, কাশগড় এবং অপরদিকে মালয়, কম্বোডিয়া, আনাম (চম্পা), সুমাত্রা (সুবর্ণ দ্বীপ), জাভা (যবদ্বীপ), বোর্ণিও প্রভৃতি অঞ্চল এই "বৃহত্তর ভারতের" অন্তর্ভুক্ত ছিল। মধ্য এশিয়া ও চীনে ভারতের হিন্দু ও বৌদ্ধগ্রন্থসমূহ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

প্রখ্যাত ইংরাজ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ অরেলষ্টাইন খোটান অঞ্চলে খনন কার্যের ফলে খোটান, কাশগড়, সমরকন্দ প্রভৃতি স্থানে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির বহু নিদর্শন পাইয়াছেন। এই সকল স্থানে বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ, বহু স্তূপ, হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি এবং সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় লিখিত বহু বৌ গ্রন্থ ও দলিল-পত্র পাওয়া গিয়াছে।

অতি প্রাচীনকালেই মধ্য এশিয়ার সহিত ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। কুষাণ নরপতিদের আদি নিবাস ছিল মধ্য এশিয়ায়। তাঁহারা মধ্য এশিয়ায় রাজনৈতিক প্রাধান্যও বিস্তার করিয়াছিলেন। কুষাণ ও পরবর্তী যুগে মহাযান বৌদ্ধধর্ম এই অঞ্চলে দ্রুত প্রসার লাভ করে। কুষাণ যুগে মধ্য এশিয়ার খোটান, কুচা, তুরফান, কাশগড় প্রভৃতি স্থানে ভারতীয়

উপনিবেশ এবং ভারতীয় সভ্যতার কয়েকটি কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। মধ্য এশিয়ার স্থলপথে ভারতে আগমন এবং ভারত হইতে প্রত্যাবর্তন



বহির্ভারতে ভারতীয় সংস্কৃতি ও উপনিবেশ

কালে হিউয়েন সাঙ্‌ এই সব অঞ্চলে বহু বৌদ্ধমঠ ও বিহার দেখিতে

পান এবং মধ্য এশিয়ার সর্বত্র ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিস্তার লক্ষ্য করিয়া অবাক হইয়া যান। ফা-হিয়েনও খোটানে বৌদ্ধধর্মের বিকাশের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। পরবর্তীকালে এইসব অঞ্চল হইতে চীন, জাপান ও কোরিয়ায় মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করে। কুষাণ আমল হইতে মধ্য এশিয়ায় ও চীনে ভারতীয় গান্ধার শিল্পরীতির প্রসার ঘটে।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতের সহিত চীনের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় অব্দে চীনে বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তন হয়। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে চীন সাম্রাটের আমন্ত্রণে বৌদ্ধাচার্য কাশ্যপমাতঙ্গ ও ধর্মরত্ন চীনে গমন করিয়া বৌদ্ধধর্ম প্রচারে ও চীনা ভাষায় বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ অনুবাদে সাহায্য করেন। কুষাণদের আমলে চীনে মহাযান বৌদ্ধধর্ম বিস্তার লাভ করে। ইহার পর চীন ও ভারতের মধ্যে বৌদ্ধভিক্ষুক ও পণ্ডিতদের যাতায়াত শুরু হয়। হিউয়েন সাঙ্, ফা-হিয়েন, ইৎসিঙ্ প্রভৃতি চীনা পরিব্রাজক বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এদেশে আসেন এবং ভারতবর্ষ হইতে গুণবর্মা, গুনভদ্র, জ্ঞানভদ্র, যশোগুপ্ত প্রভৃতি বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ চীনে গিয়া অধ্যায়ন ও অধ্যাপনায় সেখানে জীবন অতিবাহিত করেন।

বৌদ্ধধর্ম ছাড়া ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র, গণিত, চিত্রাঙ্কন, মূর্তিনির্মাণ, সঙ্গীত, শিল্প প্রভৃতি চীনে সমাদৃত হইয়াছিল। চীনের বৌদ্ধ গুহা-মন্দিরগুলি ভারতীয় ধাঁচে গড়া।

মোট কথা ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি চীনা সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিকাশে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
ভারত ও তিব্বত

খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে তিব্বত ও ভারতের মধ্যে বৌদ্ধধর্মই এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রচনা করিয়াছিল। তিব্বতের সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে ভারতীয় প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

হর্ষবর্ধনের সময়ে তিব্বতের রাজা ছিলেন স্র-সান্-গাম্পো। তিনিই

প্রথম তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তন করেন। তাঁহার রাজত্বকাল হইতেই তিব্বতে সংস্কৃত ভাষা ও ভারতীয় বর্ণমালার চর্চা আরম্ভ হয়।

বাংলার পালরাজাদের সময়ে তিব্বতে মহাযান বৌদ্ধধর্ম ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয় এবং তিব্বতের বহু স্থানে বৌদ্ধমঠ নির্মিত হয়। এই সময়ে বহু তিব্বতী পণ্ডিত ভারতে আগমন করিয়া নালন্দা, বিক্রমশীলা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে বৌদ্ধধর্মে বিশেষ জ্ঞানলাভ করেন। পরে তাঁহারা স্বদেশে ফিরিয়া বৌদ্ধধর্ম চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। ভারতবর্ষ হইতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য শান্তিরক্ষিত, পদ্মসম্ভব, কমলশীল, অতীশ দীপঙ্কর প্রভৃতি সু-প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতে গিয়া বৌদ্ধধর্মে নানা সংস্কার প্রবর্তন করেন এবং বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন।

তিব্বতে ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিতদের মধ্যে অতীশ দীপঙ্কর ছিলেন সমধিক প্রসিদ্ধ। দীপঙ্কর ছিলেন পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরের অধিবাসী। তাঁহার বাল্যকালের নাম ছিল চন্দ্রগর্ভ। অল্পবয়সেই তিনি হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়া 'দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান' উপাধি লাভ করেন। তিনি বিক্রমশীলা মহাবিহারের অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য দেশে-বিদেশে ছড়াইয়া পড়ে। অতি বৃদ্ধ বয়সে তিব্বতের রাজার আমন্ত্রণে তিনি সুদূর তিব্বতে গমন করেন এবং তিব্বতরাজ তাঁহাকে 'অতীশ' উপাধিতে ভূষিত করেন। তিব্বতের অধিবাসীরা আজও এই জ্ঞানতপস্বীকে দেবতা-জ্ঞানে শ্রদ্ধা জানায়।

তিব্বতে বহু ভারতীয় গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছে। এখানে ভারতবর্ষের ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু লুপ্ত গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। শুধু ধর্মই নহে, ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমেও প্রাচীনকাল হইতে ভারত ও তিব্বতের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

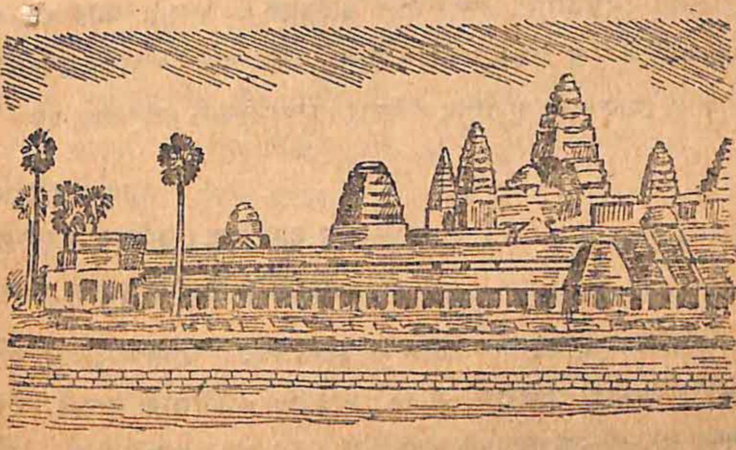
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় উপনিবেশ ও সংস্কৃতির বিস্তার: সুবর্ণভূমি: কম্বোজ ও চম্পা

ভারতের সহিত বহির্যোগাযোগ শুধু স্থলপথেই হয় নাই, সমুদ্রপথেও

ভারত প্রাচীন কাল হইতেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালয় উপদ্বীপ, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলি, বোর্নিও প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ এবং কম্বোজ, চম্পা প্রভৃতি রাজ্য প্রাচীনকালে 'সুবর্ণভূমি' নামে পরিচিত ছিল। এইসব দেশে প্রচুর মশলা ও ধাতু দ্রব্যাদি পাওয়া যাইত এবং প্রাচীনকালে ভারতীয় বণিকরা এই সব অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া প্রচুর ধনরত্ন উপার্জন করিত। এইজন্য তাহারা এই সব অঞ্চলের নাম দিয়াছিল 'সুবর্ণভূমি'। শুধু ব্যবসা-বাণিজ্য নহে প্রাচীনকালে সুবর্ণভূমিতে ভারতীয়রা উপনিবেশও স্থাপন করিয়াছিল।

ভারতীয় হিন্দু সভ্যতার প্রধান কেন্দ্র ছিল কম্বোজ। এই কম্বোজের বর্তমান নাম কাম্বোডিয়া। চীনারা ইহাকে 'ফু-নান' বলিত। কথিত আছে যে খৃষ্টীয় প্রথম শতকে কৌণ্ডিণ্য নামে এক ব্রাহ্মণ রাজকুমার স্থানীয় রাজকুমারী সোমাকে বিবাহ করিয়া কম্বোজে এক রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন।



আঙ্কোরভোটের বিষ্ণু মন্দির

কম্বোজের হিন্দুরাজারা নয় শত বৎসর ধরিয়া মহা আড়ম্বরে রাজত্ব করেন। এই রাজ্যের নরপতিগণের মধ্যে দ্বিতীয় জয়বর্মণ, যশোবর্মণ, দ্বিতীয় সূর্যবর্মণ, সপ্তম জয়বর্মণ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। সপ্তম জয়বর্মণের রাজত্বকালে বর্তমান আঙ্কোরথোমে কম্বোজের রাজধানী

স্থানান্তরিত হয়। ঐ সময়ে আঙ্কোরথোমের নাম ছিল যশোধরপুর। এই নগরটি সুন্দর পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মিত হইয়াছিল।

কম্বোজের বিশ্ববিখ্যাত আঙ্কোরভাট মন্দির ও আঙ্কোরথোমের মন্দিরসমূহ এবং তাহাদের অপরূপ কারুকার্য্যাবলী কম্বোজের উৎকর্ষ হিন্দু শিল্পকলার নিদর্শন। দ্বাদশ শতাব্দীতে রাজা সূর্যবর্মণ আঙ্কোরথোমের নিকটে আঙ্কোরভাট মন্দির নির্মাণ করেন। দুইশত একত্রিশ ফুট উচ্চ ও আটটি গগনস্পর্শী চূড়া বিশিষ্ট বিশাল এই বিষ্ণু মন্দিরটি সত্যই বিশ্বের বিস্ময়। মন্দিরের প্রাচীর গাত্রে ক্ষোদিত চিত্রগুলি সত্যই অপূর্ব।

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে কম্বোজের নিকটেই চম্পায় একটি হিন্দু রাজ্য স্থাপিত হয়। ঈশ্বরমূর্তি, রুদ্রবর্মণ, হরিবর্মণ, জয়সিংহর্মণ প্রভৃতি ছিলেন এই রাজ্যের পরাক্রমশালী নৃপতি। এই রাজ্যে বহু সমৃদ্ধশালী নগরে অসংখ্য হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির ছিল। চম্পার রাষ্ট্র ভাষা ছিল সংস্কৃত। সেখানে হিন্দুর পূজাপার্বণ অনুষ্ঠিত হইত। চম্পার মন্দিরগুলিতে ভারতীয় শিল্পকলার সুস্পষ্ট ছাপ রহিয়াছে। চম্পায় প্রায় তেরশত বৎসর কাল হিন্দু রাজত্ব অব্যাহত ছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে চীনা ও মোঙ্গলদের পুনঃপুনঃ আক্রমণে চম্পারাজ্যটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

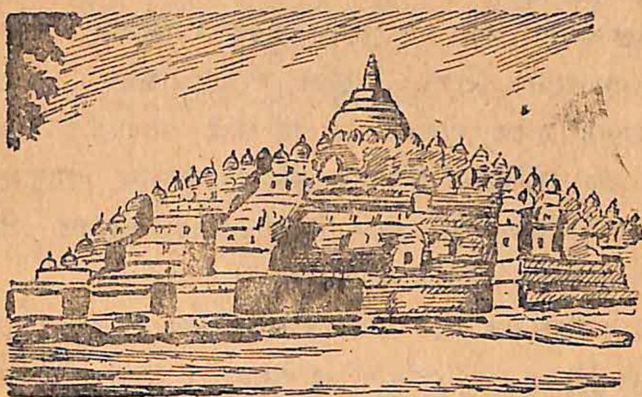
চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মালয় ও যবদ্বীপে (বর্তমানে জাভা) ভারতীয় উপনিবেশ ও সভ্যতা

রোমান ঐতিহাসিক টলেমির লেখা হইতে জানা যায় যে, খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে যবদ্বীপের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। সম্ভবতঃ এই সময়েই ভারতীয়রা এখানে বসবাস শুরু করে। খৃষ্টীয় পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতকে পশ্চিম যবদ্বীপে একটি শক্তিশালী হিন্দুরাজ্য গড়িয়া উঠে।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে শৈলেন্দ্র রাজারা যবদ্বীপ অধিকার করিয়া লন। তাঁহাদের আমলে যবদ্বীপের মধ্যস্থলে বিখ্যাত বরোবুদুরের বৌদ্ধমন্দিরটি নির্মিত হয়। একটি ছোট পাহাড়ের শীর্ষদেশে অবস্থিত চারিশত বর্গফুট

আয়তন বিশিষ্ট বরোবুদুর মন্দিরটি নয়টি স্তরে গঠিত এবং সর্বোচ্চ স্তরে রহিয়াছে মুকুটের মত একটি স্তূপ। মন্দিরের গাত্রে ক্ষোদিত রহিয়াছে কারুকার্যমণ্ডিত অসংখ্য বুদ্ধ মূর্তি এবং জাতকের কাহিনী। বরোবুদুর



বরোবুদুরের মন্দির

মন্দির 'পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য' বলিয়া অভিহিত। অনেকের মতে ভারত হইতে শিল্পীরা গিয়া এই মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। বরোবুদুরের মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পনৈপুণ্যের এক বিস্ময়কর নিদর্শন।

প্রাচীন যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত যবদ্বীপে হিন্দু সভ্যতা ও সাংস্কৃতি অক্ষুণ্ণ ছিল। এখানে সংস্কৃত ভাষার ব্যাপক প্রচলন ছিল। যবদ্বীপের সমাজ ছিল ভারতীয় সমাজ। যবদ্বীপের বহু গল্প ও সাহিত্য রামায়ণ ও মহাভারতের আখ্যান অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে মালয় উপদ্বীপে শৈলেন্দ্র বংশীয় নৃপতিরা এক পরাক্রমশালী হিন্দু রাজ্য গড়িয়া তুলেন। সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বোর্ণিও, বলিদ্বীপ, মালয় প্রভৃতি দেশগুলিকে লইয়া শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য গঠিত হয়। এই বিস্তৃত সাম্রাজ্য চারিশত বৎসরের অধিককাল শৈলেন্দ্র রাজবংশের অধিকারে ছিল। এ সাম্রাজ্য অসাধারণ প্রতিপত্তি ও গৌরব অর্জন করিয়াছিল। শৈলেন্দ্র বংশীয় নরপতিগণ 'মহারাজা'

উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজ্যে ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরের অভাব ছিল না। নবম শতাব্দীর এক আরব গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের দৈনিক আয় ছিল দুইশত মণ সোনা। শৈলেন্দ্র রাজাদের বিরাট নৌবাহিনী ছিল।

শৈলেন্দ্র রাজারা মহাযান বৌধর্মের অনুরাগী ছিলেন। বাঙ্গালী বৌদ্ধাচার্য কুমারঘোষ ছিলেন শৈলেন্দ্র বংশের রাজগুরু। বাংলার পাল রাজাদের সহিত শৈলেন্দ্র রাজাদের ঘনিষ্ট যোগাযোগ ছিল। নালন্দায় এক বৌবিহার নির্মাণের জন্য শৈলেন্দ্ররাজ বালপুত্রদেব পালরাজ দেবপালের নিকট পাঁচখানি গ্রাম চহিয়া এক দূত প্রেরণ করেন।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতে প্রথম রাজেন্দ্র চোলের রাজত্বকালে শৈলেন্দ্র রাজ্য চোল শক্তির শাসনাধীনে আসে। একাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে শৈলেন্দ্র রাজারা পুনরায় শক্তিশালী হইয়া উঠেন এবং চোল শাসন হইতে মুক্ত হন। শেষ পর্যন্ত খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে শৈলেন্দ্র রাজ্যের পতন হয়।

অনুশীলনী

বাস্তবভিত্তিক ও মৌখিক প্রশ্নাবলী :

১। চম্পার বর্তমান নাম কি ?
২। অরেল ষ্টাইন কোথাকার লোক ছিলেন ?
৩। চম্পার রাষ্ট্রভাষা কি ছিল ?
৪। শৈলেন্দ্র রাজারা কোথায় রাজত্ব করিতেন ?
৫। চীনারা কম্বোজকে কি বলিত ?
৬। শৈলেন্দ্র বংশের রাজগুরু কে ছিলেন ?

সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্নাবলী :

১। কোন্ কোন্ অঞ্চল "বৃহত্তর ভারত" নামে পরিচিত ?
২। চীন হইতে কোন্ কোন্ পরিব্রাজক ভারতে আসিয়াছিলেন এবং ভারত হইতে কোন্ কোন্ পণ্ডিত চীনে যাইয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় জীবন অতিবাহিত করেন ?

৩। স্রং-সান-গাম্পো সম্বন্ধে কি জান?

৪। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের জীবনী ও কৃতিত্ব আলোচনা কর।

৫। যশোধরপুরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৬। আঙ্কোরথোম মন্দিরটি কে নির্মাণ করেন। এই মন্দিরের বর্ণনা দাও।

৭। 'বরোবুদুর' মন্দিরটি কিরূপ ছিল?

৮। খৃষ্টিয় প্রথম শতাব্দীর প্রারম্ভে কোন্ কোন্ বৌদ্ধাচার্য চীনে গিয়াছিলেন? ঐ দেশে তাঁহারা কি করিয়াছিলেন?

রচনাত্মক প্রশ্নাবলী:

১। 'বৃহত্তর ভারত' বলিতে কি বোঝায়? মধ্য এশিয়া ও চীনে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব বর্ণণা কর।

২। তিব্বত ও ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ কিভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল বর্ণনা কর।

৩। 'সুবর্ণভূমি' বলিতে কোন্ অঞ্চলকে বুঝাইত? কম্বোজ ও চম্পায় ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপন এবং ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তারের বিবরণ দাও।

৪। মালয় ও যবদ্বীপে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রসারের বিবরণ দাও।

অধ্যায় ১৩

দিল্লীতে সুলতানী শাসন (১২০৬ খৃঃ—১৫২৬ঃ)

প্রথম পরিচ্ছেদ

তুর্ক-আফগানদের ভারতে আগমন ও শাসন

ভারতবর্ষে প্রথম মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে যখন আরবগণ সিন্ধুদেশে তাহাদের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করে। আরবদের আক্রমণে সিন্ধুর ব্রাহ্মণ রাজা দাহির পরাজিত ও নিহত হইলে আরবগণ সিন্ধু ও মুলতান অধিকার করে।

আরব অভিযানের প্রায় তিনশত বৎসর পরে ভারতভূমিতে দ্বিতীয় মুসলিম অভিযান শুরু হয়। এই মুসলমানরা ছিল তুর্কী জাতীয়। এশিয়ার তুর্কীস্তান অঞ্চলে ছিল ইহাদের বাস। ইহারা ছিল বীর যোদ্ধা, সাহসী ও উচ্চাভিলাষী। খৃষ্টীয় দশম শতকের মধ্যভাগে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে গজনী অঞ্চলে আলপ্তগীন নামে জনৈক তুর্কী নেতা একটি স্বাধীন ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতে প্রথম তুর্কী অভিযানের নেতা ছিলেন আলপ্তগীনের জামাতা সবুক্তগীন। রাজ্যজয়ের আশায় তিনি ভারতের সীমান্তে হানা দেন এবং ৯৮৬ খৃষ্টাব্দে ভারতের হিন্দু শাম বংশীয় নরপতি জয়পালকে পরাজিত করিয়া শাহী রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে লামঘান্ হইতে পেশোয়ার পর্যন্ত অধিকার করেন।

সবুক্তগীনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সুলতান মামুদ ১০০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০২৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পরপর সতের বার ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অভিযান চালাইয়া বহু নগর, মঠ ও মন্দির ধ্বংস করেন, অসংখ্য নরনারী হত্যা করেন এবং ভারতের প্রচুর ধনরত্ন লুণ্ঠন করেন। গুজরাটের বিখ্যাত সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন ও ধ্বংস করিয়া তিনি প্রায় দুইকোটি স্বর্ণমুদ্রা লাভ করেন। ভারতে রাজ্য জয় করিয়া স্থায়ী শাসন প্রতিষ্ঠা করার কোন অভিপ্রায় মামুদের ছিল না। ভারতের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া গজনীর সমৃদ্ধি করাই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল।

সুলতান মামুদের মৃত্যুর পর গজনীতে পারস্যের ঘুর বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ঘুর রাজ্যের অধিপতি মহম্মদ ঘুরী ছিলেন সমরকুশলী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী। ভারতে স্থায়ী রাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে তিনি ভারতে অভিযান করেন। তিনি তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১১৯২ খৃঃ) চৌহান নরপতি পৃথ্বীরাজকে পরাজিত ও নিহত করিয়া আজমীর ও দিল্লী অধিকার করেন। ইহার পর মহম্মদ ঘুরী কুতুবউদ্দিন আইবেক নামে এক বিশ্বস্ত সেনাপতির হস্তে ভারতের বিজিত অঞ্চলের শাসনভার ন্যস্ত করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ইহার পর কুতুবউদ্দিন রণথম্ভোর, মিরাট, রোহিলখণ্ড, কনৌজ, বারাণসী, গুজরাট প্রভৃতি জয় করিয়া উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। মহম্মদ ঘুরীই ছিলেন ভারতবর্ষে মুসলিম রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।

১২০৬ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ঘুরীর মৃত্যু হইলে কুতুবউদ্দিন গজনীর সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া দিল্লীতে এক স্বাধীন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম জীবনে কুতুবউদ্দিন ক্রীতদাস ছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বংশকে 'দাসবংশ' বলা হয়। এই সময় হইতে ভারতে সুলতানী শাসন আরম্ভ হয়।

দাস বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন গিয়াসউদ্দিন বলবন। তিনি ১২৬৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি দিল্লীর সুলতানী শাসনের মর্যাদা ও শক্তি বৃদ্ধি করেন।

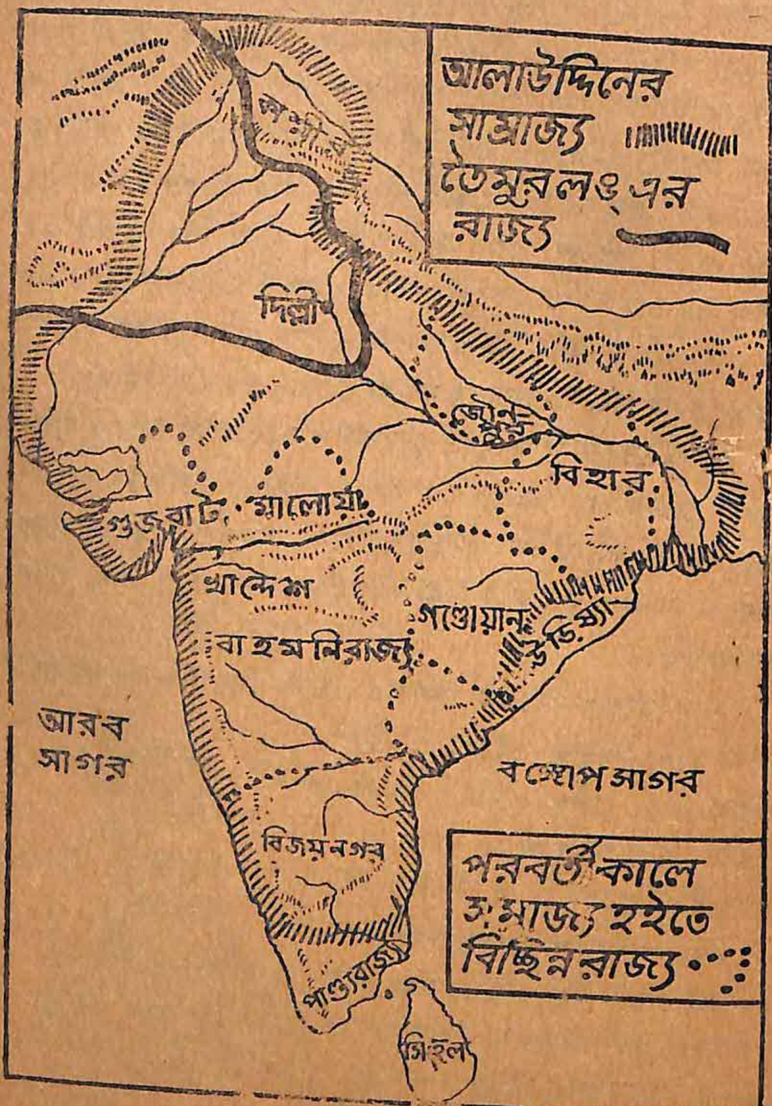
১২৯০ খৃষ্টাব্দে দাস বংশের অবসান হয় এবং খলজী বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। খলজীরা তুর্কী হইলেও দীর্ঘকাল আফগানিস্তানে বসবাস করায় তাহাদের তুর্কো-আফগান বলা যাইতে পারে।



আলাউদ্দিন খলজী

খলজী বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান আলাউদ্দিন খলজী ১২৯৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩১৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের ন্যায় তিনি

'বিশ্ববিজয়ী' হইবার আকাঙ্খা পোষণ করিতেন। উত্তর ভারতে তিনি গুজরাট, রণথম্ভোর, চিতোর, মালব, উজ্জয়িনী, চান্দেরী প্রভৃতি জয় করিয়া



সমগ্র উত্তর ভারত নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। ইহার পর তিনি সেনাপতি মালিক কাফুরকে প্রেরণ করিয়া দাক্ষিণাত্যে দেবগিরি, হোয়সল রাজ্য

এবং পাণ্ড্য রাজ্য জয় করেন। ইহার ফলে হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত প্রসারিত বিশাল অঞ্চলে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৩২০ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে খলজী শাসনের অবসান হয়, আরম্ভ হয় তুঘলক বংশের শাসন। এই বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন গিয়াসউদ্দিনের পুত্র **মহম্মদ-বিন-তুঘলক**। তাঁহার শাসনকালে মোঙ্গলরা দিল্লী পর্যন্ত অগ্রসর হইল, দেবগিরি ও হোয়সল রাজ্য বিচ্ছিন্ন হইল, বাংলাদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করিল এবং সিন্ধু বিদ্রোহী হইল। তাঁহার দেবগিরিতে রাজধানী পরিবর্তন, তামার নোটপ্রচলন প্রভৃতি ব্যর্থ পরিকল্পনার জন্য তাঁহাকে 'খামখেয়ালী' সম্রাট বলা হয়। কিন্তু তাঁহার প্রতিভা ও দূরদর্শিতার অভাব ছিল না। ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে তৈমুরের নিষ্ঠুর আক্রমণে দিল্লী ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয় এবং তুঘলক বংশের পতন হয়।



মহম্মদ-বিন-তুঘলক

ইহার পর যথাক্রমে সৈয়দবংশ (১৪১৪-১৪৫১) খৃঃ ও লোদী বংশ (১৪৫১-১৫২৬ খৃঃ) দিল্লীতে শাসন করে এবং শেষ পর্যন্ত ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে মুঘলবীর বাবরের পাণিপথ বিজয়ের ফলে ভারতে তুর্ক-আফগান সুলতানী শাসনের অবসান ঘটে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সুলতানী যুগে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন : হিন্দু ও ইসলাম ধর্মে পারস্পরিক প্রভাব : শিল্প ও সংস্কৃতির বিকাশ : আরবী ও ফারসী সাহিত্য : ভক্তিবাদ

ভারতে সুলতানী শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে এক নবযুগের সূত্রপাত হয়। বিদেশ হইতে বহু মুসলমান এদেশে আসিয়া বসবাস করিতে থাকে। কিন্তু অন্যান্য বিদেশী জাতির ন্যায় মুসলমানরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া হিন্দু সমাজে মিশিয়া যায় নাই।

সুলতানী যুগে সুলতানরা রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বোচ্চে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সম্রাটের পরেই সমাজে স্থান ছিল অভিজাতদের। এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন আমীর, উলেমা, ওমরাহগণ, প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ এবং উচ্চপদস্থ সামরিক ও রাজ কর্মচারীগণ। উচ্চরাজপদে বিশ্বস্ত মুসলমানরাই নিযুক্ত হইতেন।

সুলতানী আমলে ইসলাম ধর্ম হইতে হিন্দুধর্ম ও সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য হিন্দুধর্মের রক্ষণশীলতা ও বিধিনিষেধের কঠোরতা বৃদ্ধি পায়। সমাজে পুরুষেরই প্রাধান্য ছিল। পর্দাপ্রথা মুসলমান স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে প্রচলিত ছিল। ক্রমে উচ্চশ্রেণীর হিন্দু নারীদের মধ্যে অবরোধ প্রথা প্রবর্তিত হয়। সমাজে ক্রীতদাস প্রথার ব্যাপক প্রচলন ছিল।

সুলতানের রাজদরবার ছিল ধনসম্পদের রীতিমত প্রদর্শনী। আমীর ওমরাহদের হাতে প্রচুর অর্থ ছিল। কিন্তু সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না। দেশের অধিকাংশ লোক গ্রামে বাস করিত। তখন গ্রাম্য কৃষি জীবনের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে হিন্দু বণিকদের প্রাধান্য ছিল। সে সময়ে এশিয়া, আফগানিস্তান, তিব্বত, ভুটান প্রভৃতি দেশের সঙ্গে ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য চলিত। বাংলা দেশ সে সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল।

দীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাসের ফলে হিন্দু ও মুসলমান সমাজ পরস্পরকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। হিন্দু সমাজে বহু মুসলমান রীতিনীতির প্রবর্তন হয় এবং হিন্দু সমাজের আচার-আচরণ মুসলমান সমাজে বিস্তারলাভ করে। সুলতানী আমলের শাসকেরা শিল্পানুরাগী ছিলেন। এই যুগের শিল্পরীতি হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির সংমিশ্রণে উদ্ভূত হইয়াছিল। 'এই জন্য এই শিল্পরীতিকে ইন্দো-ইসলামী শিল্পরীতি' বলা হয়। এই শিল্পরীতি অনুসরণ করিয়া সে যুগে বহু প্রাসাদ, স্মৃতিসৌধ ও মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল।

সুলতানী যুগে শাসকরা অনেকেই সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। সে

যুগে সরকারী ভাষা ফারসী হইলেও আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি হইয়াছিল। হিন্দী, আরবী, ফার্‌সী, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার যথেষ্ট চর্চা হইত সে যুগে। তুর্ক-আফগান যুগে উর্দু ভাষার উদ্ভব হইয়াছিল।

সে যুগে আরবী ও ফার্‌সী ভাষায় বহু কাব্যগ্রন্থ, ধর্মগ্রন্থ, ইতিহাস, ব্যাকরণ প্রভৃতি রচিত হইয়াছিল। বলবনের সভাকবি আমীর খসরু ছিলেন সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ। তিনি 'হিন্দুস্তানের তোতাপাখী' নামে অভিহিত ছিলেন। এই যুগে বহু সংস্কৃত গ্রন্থ ফার্‌সী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল।

সুলতানী যুগে 'ভক্তিবাদ' নামে ধর্মনৈতিক আন্দোলন এক স্মরণীয় ঘটনা। 'ভক্তিবাদে'র মূলকথা হইল ঈশ্বরে ঐকান্তিক ভক্তি, উদার দৃষ্টিভঙ্গী, সৎকর্ম, সদাচরণ, সকল ধর্মে শ্রদ্ধা ও একেশ্বরে বিশ্বাস। 'ভক্তিবাদ' ভারতের হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতি ও মিলনের পথ সহজ করে। সুলতানীযুগে ভক্তিবাদ প্রচারকদের মধ্যে বাংলার শ্রীচৈতন্য, পাঞ্জাবের নানক, ও বারানসীর কবীর বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন।


শ্রীচৈতন্য

শ্রীচৈতন্য : ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে বাংলার নবদ্বীপে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে শ্রীচৈতন্য জন্মগ্রহণ করেন। চব্বিশ বৎসর বয়সে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বহু স্থানে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন। যবন হরিদাসও তাঁহার শিষ্য ছিলেন। তাঁহার প্রেমধর্ম সারা দেশে এক উন্মাদনার সৃষ্টি করিয়াছিল। মৃতপ্রায় হিন্দুধর্মে তিনি নূতন করিয়া প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে নূতন দিগন্ত উন্মোচন করিয়া দেন।

নানকঃ নানক ছিলেন মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রচারক। ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে লাহোর জেলার তালবন্দী গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।



নানক।

তিনি ছিলেন শিখ ধর্মের প্রবর্তক। তিনি জাতিভেদ মানিতেন না এবং একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন, 'মানুষের একমাত্র আশ্রয় ঈশ্বর, জাতিভেদ মিথ্যা, রাম ও রহিম এক ও অভিন্ন।' তাঁহার উপেদেশাবলী সঙ্কলিত হইয়াছে 'গ্রন্থ সাহেব' নামক গ্রন্থে।

কবীরঃ কবীর বৈষ্ণবধর্ম প্রচারক রামানন্দের শিষ্য ছিলেন। তিনি হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে হিন্দু ও মুসলমান একই মৃত্তিকায় নির্মিত দুইটি পাত্র বিশেষ। তাঁহার রচিত 'দোঁহাগুলি হিন্দী সাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ।



কবীর

কবীরের ধ্যানের ঈশ্বর বলেন—

'হে আমার ভৃত্য, তুমি আমাকে কোথায় খুঁজিতেছ? দেখ আমি তোমার পাশেই আছি। আমি মন্দিরেও নাই, মসজিদেও নাই: আমি কাবাতেও নাই, কৈলাসেও নাই, আমি আচারেও নাই, অনুষ্ঠানেও নাই, যোগেও নাই, ত্যাগেও নাই।'

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইলিয়াস হুসেন শাহী যুগে বাংলা সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা : মধ্যযুগের ভারতের শাসন ব্যবস্থা

খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগ হইতে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ইলিয়াস ও হুসেন শাহী বংশের সুলতানেরা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। তাঁদের আমলে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে এক নবযুগের সূচনা হয়।

সুলতানী আমলে বাংলায় বহু হিন্দু সরকারী উচ্চপদ ও ধন সম্পদের লোভে এবং মুসলমানদের অত্যচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ইসলাম ধর্মগ্রহণ করে। তাহা ছাড়া, এই সময়ে হিন্দু ধর্মেকর্মে নানা অনাচার দেখা যায়। স্মৃতিশাস্ত্রের পণ্ডিত রঘুনন্দন কিছু সামাজিক বিধান প্রবর্তন করিয়া হিন্দু সমাজকে তখন রক্ষা করেন। আর হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করেন নবদ্বীপের শ্রীচৈতন্য। হুসেন শাহের রাজত্বকালে তাঁহার আবির্ভাব এক অবিস্ময়ণীয় ঘটনা।

দীর্ঘদিন পাশাপাশি অবস্থানের ফলে অবশ্য হিন্দু ও মুসলমানের জাতিগত বিরোধ হ্রাস পাইতে থাকে। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই পরস্পরের সামাজিক রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহার গ্রহণ করে। উভয়েই পীরের নামে শিরনি মানত করিত। হুসেন শাহ বহু হিন্দুকে উচ্চ সরকারী পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

সুলতানী আমলে বাংলা সাহিত্যের অসাধারণ উন্নতি হইয়াছিল। কবি চণ্ডীদাসের সুমধুর পদাবলী, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, বিজয়গুপ্তের 'মনসামঙ্গল,' মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ বিজয়,' 'পরাগলী মহাভারত' প্রভৃতি সে যুগের অক্ষয় সাহিত্য কীর্তি। সে যুগে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যেরও চর্চা হইত। নবদ্বীপ ছিল সংস্কৃত শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র। ইহা ছাড়া তখন ফারসী ও আরবী ভাষারও চর্চা ছিল।

বাংলার সুলতানরা শিল্পকলারও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পাণ্ডুয়ার 'আদিনা মসজিদ', গৌড়ের বড় ও ছোট 'সোনা মসজিদ', বাগেরহাটের 'সাত গম্বুজ মসজিদ' সে যুগের স্থাপত্যশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

সুলতানী আমলে বাংলাদেশ ধনসম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। দেশে তখন প্রচুর শস্য ফলিত, ব্যবসা-বাণিজ্যেরও উন্নতি হইয়াছিল। বাঙ্গালী বণিকেরা তখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে যাতায়াত করিত। সে সময়ে বাংলার লাক্ষা ও রেশম শিল্প প্রসিদ্ধ ছিল। সুলতানী মুদ্রা ছাড়া তখন কেনা বেচায় কড়ি ব্যহৃত হইত।

মধ্যযুগের শাসন ব্যবস্থা : মধ্যযুগে তুর্কী-আফগান শাসনাধীনে ভারতবর্ষ একটি ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছিল। সুলতান ছিলেন সকল ক্ষমতার উৎস, শাসন ক্ষেত্রের সর্বোচ্চে অধিষ্ঠিত। কয়েকজন মন্ত্রীর সাহায্যে তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীকে 'উজির' বলা হইত। রাজ্যের বিচারকার্যের ভার ছিল কাজীর উপর। রাজস্ব বিভাগে বহু হিন্দু কর্মচারী ছিলেন।

শাসনকার্যের সুবিধার জন্য সমগ্র রাজ্যটি বিশ হইতে পঁচিশটি 'ইক্তা'য় বিভক্ত ছিল। 'ইক্তা'র শাসনকর্তাকে বলা হইত 'মুকতি'। 'ইক্তাগুলি' যথাক্রমে, শিক,' 'পরগণা' প্রভৃতিতে বিভক্ত ছিল।

গ্রামছিল দেশের শাসনব্যবস্থার ক্ষুদ্রতম একক। গ্রাম্য পঞ্চায়েতের উপর গ্রাম এলাকার শাসন ও বিচারের ভার ন্যস্ত ছিল। গ্রাম চৌকিদার পুলিশের কাজ করিত। দেশে গুপ্তচর প্রথার প্রচলন ছিল। দণ্ডবিধি কঠোর ছিল। 'জিজিয়া,' 'ভূমিকর', 'গৃহকর', 'গোচারণ কর' প্রভৃতি আদায় করা হইত।

অনুশীলনী

বাস্তবভিত্তিক ও মৌখিক প্রশ্নাবলী :

১। 'হিন্দুস্তানের তোতাপাখী' কাহাকে বলা হইত ?

২। 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' গ্রন্থ কে রচনা করেন ?

৩। সুলতানী যুগে প্রধানমন্ত্রীকে কি বলা হইত ?

৪। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবকালে বাংলাদেশের শাসনকর্তা কে ছিলেন ?

৫। পৃথ্বিরাজ কোন বংশীয় রাজা ছিলেন ?

৬। ভারতবর্ষে মুসলিম রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন ?

৭। 'মনসামঙ্গলে'র রচয়িতা কে ?

৮। 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' কে রচনা করিয়াছিলেন ?

৯। কত খ্রীষ্টাব্দে তৈমুরের আক্রমণে তুঘলক বংশের পতন হয় ?

১০। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই কাহার নামে শিরনি মানত করিত ?

১১। মহম্মদ-বিন্-তুঘলক দিল্লী হইতে কোথায় রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী :

১। 'দাস বংশ' কে প্রতিষ্ঠা করেন ? 'দাস বংশ' নামকরণ কেন হইয়াছিল ?

২। বিজেতা হিসাবে আলাউদ্দিন খলজীর পরিচয় দাও।

৩। সুলতানী যুগে ভারতের সাহিত্যে ও শিল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৪। সুলতানী যুগে ভারতের শাসনব্যবস্থা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

রচনাত্মক প্রশ্নাবলী :

১। ভারতের মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠার কাহিনী বর্ণনা কর।

২। ইতিহাসে 'খামখেয়ালী সম্রাট' কাহাকে বলা হয় ? তাঁহার শাসনকালের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলির উল্লেখ কর।

৩। সুলতানী যুগে ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৪। 'ভক্তিবাদ' বলিতে কি বুঝায় ? শ্রীচৈতন্য, নানক ও কবীরের প্রচারিত ধর্মের মূল কথাগুলি লিখ।

৫। ইলিয়াস সাহী ও হুসেনসাহী যুগের বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় দাও।

অধ্যায় ১৪	ইউরোপে মধ্যযুগের অবসান (খৃষ্টীয় চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতক)

প্রথম পরিচ্ছেদ

কনস্টান্টিনোপলের পতন

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে মোঙ্গল নায়ক চেঙ্গিজ খাঁর আক্রমণে তুর্কীদের এক শাখা তাহাদের দলপতি তুঘ্রিলের নেতৃত্বে পশ্চিম তুর্কীস্তান হইতে বহির্গত হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে শেষপর্যন্ত অনাটোলিয়া (বর্তমান এশিয়া মাইনর) নামক স্থানে উপস্থিত হয়। অনাটোলিয়া তখন সেল্‌জুক তুর্কীদের অধীনে ছিল। সেল্‌জুক তুর্কীদের পতনোন্মুখ অবস্থা দেখিয়া তুঘ্রিলের পুত্র ওসমান আনাটোলিয়ায় এক স্বাধীন রাজ্য গড়িয়া তুলেন। ইহাদের 'অটোমান তুর্ক' বলা হইত।

ক্রমে অটোমান তুর্কীরা পশ্চিম এশিয়ার ম্রিয়মাণ বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের অঞ্চলগুলি অধিকার করিয়া লয়। তারপরে তাহাদের দৃষ্টি পড়ে ইউরোপের দিকে। তাঁহারা ধীরে ধীরে সার্বিয়া, বুলগেরিয়া, বলকান উপদ্বীপের সমস্ত অংশেই আধিপত্য বিস্তার করে।

চতুর্দশ শতকের শেষভাগে অটোমান সুলতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুলতান প্রথম বায়াজিদ কনস্টান্টিনোপল নগরী অবরোধ করেন। কিন্তু এইসময়ে মোঙ্গল নায়ক তৈমুরলঙের আক্রমণে বায়াজিদ পরাজিত ও নিহত হন (১৪০২ খৃঃ)। কনস্টান্টিনোপল সে যাত্রা রক্ষা পায়।

১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে অটোমান সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদ বিরাট বাহিনী লইয়া বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল জয় করেন। পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতনের প্রায় এক হাজার বৎসর পরে পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের অবসান হয়। কনস্টান্টিনোপলের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে মধ্যযুগের অবসান হইল, সূত্রপাত হইল আধুনিক যুগের। পশ্চিম ইউরোপে ইতিমধ্যেই রেনেসাঁস বা নবজাগরণের নবীন আলো তখন বিচ্ছুরিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কনস্টান্টিনোপলের পতনের প্রতিক্রিয়া ঃ রেনেসাঁসের বৈশিষ্ট্য ঃ ভৌগোলিক আবিষ্কার

পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপলের পতনের সাথে সাথে সেখানকার সংস্কৃতিক জীবনও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সেখানকার পণ্ডিতগণ কনস্টান্টিনোপল ত্যাগ করিয়া পুঁথিপত্রসহ ছুটিলেন পশ্চিম ইউরোপের নানা স্থানে বিশেষ করিয়া ইটালীতে। তাঁহাদের প্রেরণায় ইউরোপে গ্রীক-লাটিন সাহিত্য-দর্শনাদির নূতন করিয়া পরিচয় ঘটিল, চিন্তা ও ভাবজগতে নূতন সাড়া পড়িল, রেনেসাঁস যুগের সূত্রপাত হইল। রেনেসাঁসের মাধ্যমেই আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশ লাভ করে।

'রেনেসাঁস' কথাটির অর্থ পুনর্জন্ম। খৃষ্টীয় পঞ্চদশও ষোড়শ শতকে প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সাহিত্য, দর্শন, শিল্পকলা চর্চার ফলে ইউরোপে চিন্তা ও ভাব ভগতের এক সুদূর প্রসারী পরিবর্তন দেখা যায়, ইউরোপ যেন এক নবজীবন লাভ করে। এই দিক দিয়া 'রেনেসাঁস' কথাটি সার্থক।

সব কিছু জানিবার আগ্রহ. চিন্তার স্বাধীনতা, যুক্তিতর্কের কষ্টিপাথরে সব কিছু যাচাই করা, জীবনকে নূতন করিয়া উপলব্ধি করা, মধ্যযুগীয় সংস্কার ও অনুশাসনের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া জীবনকে সুন্দর মুক্ত ও উদার করিয়া তোলাই ছিল রেনেসাঁসের বৈশিষ্ট্য।

রেনেসাঁসের প্রভাবে ইউরোপীয় সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি, ধর্ম, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্র—সর্বক্ষেত্রেই এক নূতন চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গীর সৃষ্টি হয়।

রেনেসাঁসের প্রথম সূত্রপাত হয় ইটালীতে, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে। সাহিত্যে ইটালীর মানবপ্রেমিক কবি পেত্রার্ক ও গল্প লেখক বোকাচ্চিও এবং ইংলণ্ডের মহাকবি ও নাট্যকার সেক্সপীয়র, রাজনীতিক্ষেত্রে ফ্লোরেন্সের অধিবাসী ম্যাকিয়াভেলি, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় ফ্লোরেন্সের মাইকেল এঞ্জেলো, লিওনার্দো-দ্য-ভিঞ্চি ও র‍্যাফেল অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দেন এবং নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্তন করেন।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক সত্য উদ্ঘাটিত হয় রেনেসাঁসের যুগে। মধ্যযুগের জ্যোতির্বিদগণ মনে করিতেন যে পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া সূর্য ও গ্রহ নক্ষত্রাদি ঘুরিতেছে। পোল্যাণ্ডের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক কোপারনিকাস আবিষ্কার করেন যে সূর্যকে কেন্দ্র করিয়াই পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ ঘুরিতেছে। এইসময়ে ইটালীর প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও সর্বপ্রথম দূরবীক্ষণ যন্ত্র প্রস্তুত করেন এবং এই যন্ত্রের সাহায্যে কোপারনিকাসের আবিষ্কার অভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণ করেন।

রেনেসাঁসের প্রভাবে ধর্ম সংস্কারেরও আন্দোলন আরম্ভ হয়। পোপ ও পুরোহিতদের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে জনমত সোচ্চার হইয়া উঠে। জার্মান অধ্যাপক মার্টিন লুথার, জেনিভার জন কেল্‌ভিন প্রমুখ ধর্মসাংস্কারকগণ প্রবল আন্দোলন শুরু করিলেন। খৃষ্টান ধর্ম দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গেল—পোপপন্থী 'রোমান ক্যাথলিক' এবং লুথারপন্থী 'প্রোটেস্টান্ট'।

রেনেসাঁসের প্রভাবে মধ্যযুগীয় সমুদ্রযাত্রার আতঙ্ক দূর হইল। ইউরোপীয় নাবিকগণ অজানার উদ্দেশ্যে সমুদ্রপথে পাড়ি দিলেন। তন্মধ্যে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামার ইউরোপ হইতে ভারতে আসিবার জলপথ আবিষ্কার, ইটালীর অধিবাসী কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার এবং পর্তুগীজ নাবিক ফার্ডিনাণ্ড ম্যাগেলানের পশ্চিমের পথে আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করিয়া ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার উল্লেখযোগ্য।

ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে আটলান্টিক, প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগর অতিক্রম করিয়া সামুদ্রিক বাণিজ্য পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িল। বড় বড় জাহাজ নির্মিত হইল, যান্ত্রিক শিল্পের প্রসার ঘটিল, ইহার পর পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় ইউরোপ মনোনিবেশ করিল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইউরোপীয় সভ্যতার সূত্রপাত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
ইউরোপে জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব : ইউরোপের বিস্তৃত : পুরাতন বনাম নূতন নিয়মতন্ত্র : ইংলণ্ডে বিপ্লব

মধ্যযুগে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য এবং খৃষ্টান ধর্মাধিষ্ঠানের ধর্মীয় আদর্শ ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে ঐক্য বজায় রাখিয়াছিল। কিন্তু মধ্যযুগের শেষভাগে সম্রাটও ভগবানের প্রতিনিধি হিসবে রোমান সাম্রাজ্যের অধিনায়কত্ব দাবী করেন। ইহারফলে সম্রাট ও পোপ উভয়েরই তীব্র দ্বন্দ্বে শক্তি ক্ষয় হইতে থাকে। মধ্যযুগের শেষভাগে সামন্তপ্রথা দুর্বল হইয়া পড়ে। স্পেন, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, পর্তুগাল প্রভৃতি দেশে রাজশক্তি ক্রমে শক্তি সঞ্চয় করিয়া জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। নেদারল্যাণ্ডের প্রোটেস্টান্ট অধিবাসীরা গোঁড়া রোমান ক্যাথলিক স্পেন সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপের অমানুষিক অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া স্বাধীনতালাভের জন্য সংগ্রাম করে এবং শেষ পর্যন্ত সফল হয়।

ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতি ইউরোপের দৃষ্ট পড়ে। প্রধান প্রধান ইউরোপীয় রাষ্ট্র তাহাদের পরিমিত ভূখণ্ড অতিক্রম করিয়া উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য বিস্তারের কামনায় অনগ্রসর অঞ্চলে সম্প্রসারণের নীতি গ্রহণ করে।

মধ্যযুগে রাষ্ট্রের সকলক্ষমতা কেন্দ্রীয়ভূত হইয়াছিল রাজার হাতে। রাজকীয় ক্ষমতা ছিল স্বৈরতন্ত্রের নামান্তর। রেনেসাঁসের প্রভাবে নূতন চিন্তাধারার প্রবর্তন হয়। ফলে রাজা ভগবানের প্রতিনিধি' এই যুক্তি অসার বলিয়া গৃহীত হয়; শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ডে রাষ্ট্রবিপ্লব শুরু হয় এবং ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে 'গৌরবময় বিপ্লবে'র অবসানে পার্লামেন্টের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং রাজার ক্ষমতা বহুলাংশে খর্ব করা হয়। অধুনা রাজতন্ত্রের পরিবর্তে গণতন্ত্র প্রায় সর্বত্রই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নবীন সূর্যালোকে নিপীড়িত জনগণের জয়, প্রজাতন্ত্রের জয় দিকে দিকে ঘোষিত হইতেছে।

অনুশীলনী

বাস্তবভিত্তিক ও মৌখিক প্রশ্নাবলী :

১। কোন্ খ্রীষ্টাব্দে কনস্টান্টিনোপলের পতন হয়?
২। ম্যাগেলান কোন্ দেশীয় নাবিক ছিলেন?
৩। খ্রীষ্টধর্মের পোপ পন্থীরা কি নামে অভিহিত?
৪। পশ্চিম রোম-সাম্রাজ্যের পতনের কত বৎসর পরে পূর্ব রোম-সাম্রাজ্যের পতন হয়?
৫। কোপারনিকাস কি আবিষ্কার করিয়াছিলেন?
৬। ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে গৌরবময় বিপ্লবের ফলে ইংলণ্ডে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কি পরিবর্তন হইয়াছিল?
৭। প্রথম বায়াজিদ কে?
৮। মার্টিন লুথার বিখ্যাত কেন?
৯। সর্বপ্রথম কে দূরবীক্ষণ যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন?
১০। কত খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় মহম্মদ কনস্টান্টিনোপল জয় করেন?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী :

১। অটোমান-তুর্ক কাহাদিগকে বলা হয়? কোথায় এবং কেমন করিয়া তাহারা রাজ্য গঠন করে?
২। কিভাবে কনস্টান্টিনোপলের পতন হইল বর্ণনা কর।

রচনাত্মক প্রশ্নাবলী :

১। 'রেনেসাঁস কথাটির অর্থ কি? রেনেসাঁসের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ কর।

২। রেনেসাঁস যুগে ভৌগোলিক আবিষ্কার ও তাহার প্রভাব বর্ণনা কর।